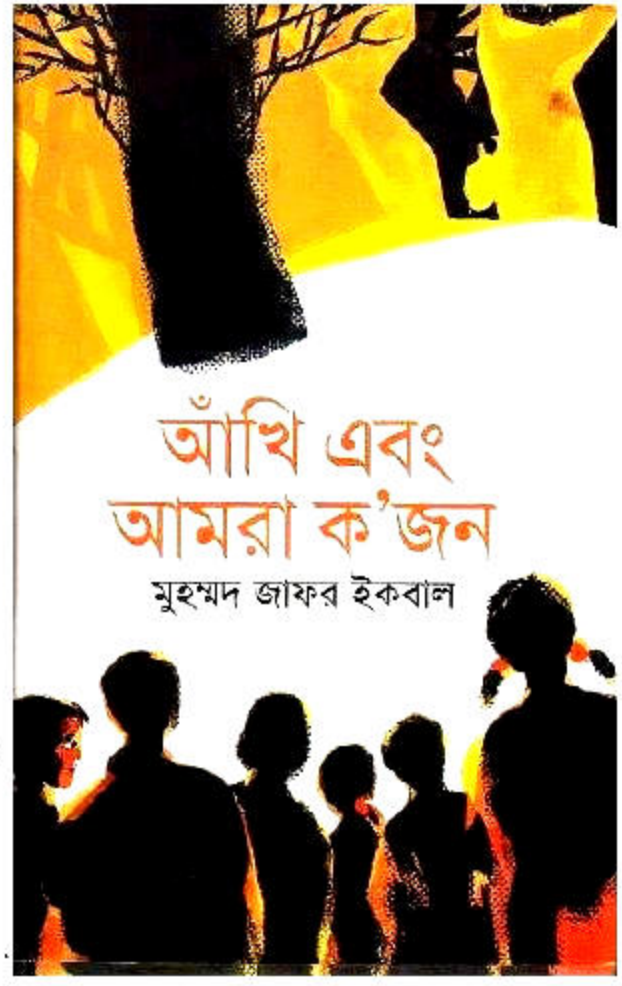

১
যখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের জীবনের কোথাও ছিটেফোঁটা আনন্দ নেই

কিছুদিন থেকে আমার দিনকাল বেশি ভালো যাচ্ছে না। আসলে শুধু কিছুদিন না—আমি যদি একটু চিন্তা করি তা হলে মনে হতে থাকে যে অনেকদিন থেকেই আমার দিনকাল বেশি ভালো যাচ্ছে না। আমি যদি সবকিছু ছেড়েছুড়ে অনেকক্ষণ ধরে খুব গভীরভাবে চিন্তা করি তা হলে মনে হয় আমি বের করে ফেলতে পারব যে আসলে কখনোই আমার দিনকাল বেশি ভালো যায় নাই। (তবে আমি কখনোই কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি না—যে কোনো জিনিস নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করলেই আমার কেমন জানি দম আটকে আসে।)

আমার যে দিনকাল ভালো যাচ্ছে না সেটা বোঝার জন্যে খুব বেশি চিন্তা করার দরকারও হয় না—চিন্তা না করেও সেটা বের করে ফেলা যায়। আমরা দুই ভাই, আমার বড় ভাইয়ের নাম টিটু আমার নাম তিতু। বড় ভাইকে সবাই ঠিক করে ডাকে টিটু, বেশিরভাগ মানুষ আমাকে তিতু না ডেকে ডাকে তিতা। যারা আবার একটু বেশি ঢং করতে চায় তারা মুখটা সুচালো করে নাকি সুরে বলে তেঁতোঁ, তারপর এমনভাবে মুখের একটা ভঙ্গি করে যেন কেউ সত্যি সত্যি তাদের মুখে তেতো করলার রস ঢেলে দিয়েছে। আমি ঠিক করেছি বড় হওয়া মাত্রই হাইকোর্টে মামলা করে আমার নামটা বদলে ফেলব। কী নাম নেব

এখনো ঠিক করি নাই—তবে সেই নাম নিয়ে কেউ যে ঢং করতে পারবে না সেটা আমি এখন থেকেই ঘোষণা দিয়ে রাখতে পারি।

আমাদের বাসায় আমরা টিটু তিতু এই দুই ভাই ছাড়াও আছে আমার আব্বু, আম্মু আর ফুলি খালা। আব্বু ব্যাংকে চাকরি করেন আম্মু একটা স্কুলে পড়ান আর বলা যেতে পারে ফুলি খালা আমাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন। ফুলি খালার মেজাজ অবিশ্যি খুবই গরম, দুই তিন দিন পরে পরেই চিৎকার করে বলেন, "আমি আর এই বাসায় থাকব না! এই বাসায় কোনো মানুষ থাকতে পারে না। এখানে কোনো রকম নিয়মনীতি নাই, কোনো রকম শৃঙ্খলা নাই, আমি একজন মানুষ কতো কাজ করব? বাসায় কাজ করি তার মানে কি আমি ক্রীতদাস? শপিংমল থেকে আমাকে কিনে এনেছে?"

ফুলি খালা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছেন তাই কথাবার্তা বলেন শুদ্ধ ভাষায়। আমি ভুলভাল কথা বললে মাঝে মাঝে আমাকে শুদ্ধ করে দেন। আমাদের বাসায় আমরা সবাই ফুলি খালাকে ভয় পাই। সবচাইতে বেশি ভয় পান আম্মু আর তার থেকেও বেশি ভয় পান আব্বু। যখন ফুলি খালা কাছাকাছি থাকেন না তখন আম্মু চোখ পাকিয়ে বলেন, "এই ফুলিকে আমি বাসা থেকে বিদায় করব। কাজের বুয়া হয়ে আমাদের সাথে কী ভাষায় কথা বলে লক্ষ্য করেছ?"

আব্বু বলেন, 'লক্ষ্য করি নাই আবার। সে কি ভলান্টারি কাজ করে? মোটেই না। মাসের শেষে গুনে গুনে টাকা দেই। দুই ঈদে বোনাস।"

"গত ঈদে শাড়ি কিনে দিয়েছি।"

"কতো বড় সাহস—আমি রাতে টেলিভিশন দেখছি, আর আমাকে এসে বলে, অনেক রাত হয়েছে। টেলিভিশন বন্ধ করে ঘুমাতে যান। বলে খট করে টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিল!"

আম্মু নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। আবার যখন ফুলি খালা আশেপাশে থাকেন তখন দুইজনই একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে যান। আম্মু আহ্লাদি গলায় বলেন, "ফুলি, তোমার চিকেনটা আজকে যা ভালো হয়েছে কী বলব!"

আব্বু বলেন, "ইউ আর এ জিনিয়াস ফুলি। তোমার আসলে ফাইভ স্টার হোটেলে কুক হওয়া উচিত ছিল।"

আম্মু বলেন, "গ্রামের বাড়িতে তোমার সবাই ভালো আছে তো?"

আব্বু বলেন, "সামনের মাসে তোমাকে একটা মোবাইল টেলিফোন কিনে দেই। তা হলে যখন ইচ্ছা হবে বাড়িতে কথা বলতে পারবে।"

তখন ফুলি খালা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, "এর চাইতে লোহার শিক গরম করে আমার কপালে দুইটা ছ্যাঁকা দেন। মোবাইল ফোন আর টেলিভিশন এই দুই জিনিস আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। কে এই দুইটা জিনিস আবিষ্কার করেছিল কে জানে—তার ওপরে নিশ্চয়ই আল্লাহর গজব পড়বে।"

আব্বু আর আম্মু দুইজনেই ফুলি খালার কথার সাথে সাথে মাথা ঝাঁকাতে থাকেন। আম্মু বলেন, "ঠিকই বলেছ ফুলি। মোবাইল টেলিফোনে বেশি কথা বললে নাকি ব্রেনের মাঝে ক্যান্সার হয়।"

আব্বু বলেন, "ইউ আর রাইট ফুলি। ইউ আর হাভ্রেড পার্সেন্ট রাইট। পৃথিবী থেকে টেলিভিশন ব্যান করে দেওয়া দরকার! সময়ের কী ভয়াবহ অপচয়।"

এই হচ্ছে আমার আব্বু আম্মু আর ফুলি খালা। তবে এই তিনজনকে নিয়ে আমার বেশি সমস্যা নাই—আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমার বড় ভাই টিটুকে নিয়ে। সে কিছুদিন আগেও ঠিকঠাক ছিল আস্তে আস্তে কেমন যেন আজব হয়ে গেল। এখন দিনরাত খালি সে পড়ে, পড়তে পড়তে তার চেহারার মাঝে ভালো ছাত্র ভালো ছাত্র ভাব চলে এসেছে। ঘাড়টা একটু কুঁজো, গলাটা চিকন, চোখ দুইটা গর্তের ভিতর এবং ঠোঁটের ওপর খুব হালকা গোঁফ গজাবার চিহ্ন। যতক্ষণ স্কুলে থাকে ভাইয়া কী করে আমি জানি না কিন্তু যতক্ষণ বাসায় থাকে ততক্ষণ সে গুনগুন গুনগুন করে নাকি সুরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কিছু একটা মুখস্থ করে। আমি আর তার ধারেকাছে যাই না, গেলেই তার বইটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "এই তিতা, দেখ দেখি আমার এই পৃষ্ঠাটা ঠিকমতন মুখস্থ হয়েছে কি না।"

তারপর সে মুখস্থ বলে যেতে থাকে, "মহাকর্ষ বল ভর দুটির গুণফলের সমানুপাতিক এবং দুইটি ভরের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। উল্লেখ্য যে, মহাকর্ষ বল সার্বিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্যে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করা হইয়াছে। এম কে এস পদ্ধতিতে এই ধ্রুবকের মান ছয় দশমিক ছয় সাত চার গুণন দশ ঊর্ধ্বঘাত ঋণাত্মক এগারো..."

ক্লাসের পড়া করার জন্যে আমাকেও মুখস্থ করতে হয় কিন্তু ভাইয়ার মতো দাঁড়ি কমাসহ মুখস্থ করতে আমি কাউকে দেখি নি। এই ব্যাপারটাতে সে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক্সপার্ট। আমার আব্বু আর আম্মু এখন ভাইয়ার উপরে খুব খুশি। বাসায় কেউ বেড়াতে এলেই আব্বু-আম্মু টিটুকে দেখিয়ে

বলেন, "এই যে টিটু, আমাদের বড় ছেলে। লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ। সামনের বার এসএসসি দিবে। পরীক্ষার এখনো দেড় বছর বাকি, এর মাঝে সারা বই মুখস্থ করে ফেলেছে।"

ভাইয়ার মুখে তখন অহংকারের একটা হাসি ফুটে ওঠে, সে তখন তার কুঁজো ঘাড়টা সোজা করার চেষ্টা করে। আমি সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমাকে ডেকে আনা হয়। সামনে আসার পর আম্মু না হয় আমু দুজনেই হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলেন, "এই যে আমাদের ছোট ছেলে তিতু। পড়ালেখায় মনোযোগ নাই। বড় ভাইকে দেখেও কিছু শিখল না।"

যারা বেড়াতে আসেন তাদের মাঝে এক দুইজন ভালো মানুষ থাকে, তারা বলে, "আরে কী বলেন আপনি। কী ব্রাইট চেহারা তিতুর, দেখবেন একটু বড় হলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই ভাইয়া বলে, "হবে না। আমি টেস্ট করেছি।"

"কী টেস্ট করেছ?"

"তিতু মুখস্থ করতে পারে না। যেমন মনে করেন একটা আস্ত পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে আমার লাগে তেতাল্লিশ মিনিট। তিতু তিন ঘণ্টাতেও পারে না। প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলে।"

সবাই তখন দুশ্চিন্তায় মাথা নাড়ে। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকি। শুধু যে বাসায় কেউ বেড়াতে এলে আমাকে অপমান করা হয় তা নয়, এমনিতেই ভাইয়া সারাক্ষণ আমাকে অপমান করে যাচ্ছে। বন্ধুর কাছ থেকে হয়তো একটা ফাটাফাটি ডিটেকটিভ বই এনেছি, রাতে বসে বসে পড়ছি তখনি ভাইয়া নাকি সুরে নালিশ করে দেবে, "আম্মু, তিতা আউট বই পড়ছে!" আম্মু এসে বইটা কেড়ে নেবেন। আমি হয়তো একটা অঙ্ক করার চেষ্টা করছি তখনি ভাইয়া নালিশ করে দেবে, "আম্মু তিতা পড়ছে না।" আম্মু এসে চোখ পাকিয়ে বলবেন, "কী করছিস তিতু?"

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, "অঙ্ক করছি।"

আম্মু বলেন, "অঙ্ক করার কী আছে? সময় নষ্ট করে লাভ কী? নোট বইয়ে সব অঙ্ক করে দেওয়া আছে। দেখে নে। এত টাকা দিয়ে নোট বই কিনে দিলাম কেন?"

তারপরেও মাঝে মাঝে বলি, "নিজে নিজে করতে চাচ্ছিলাম—"

"নিজে নিজে? নিজে নিজে করার কী আছে? তুই কি মনে করিস যারা এই নোট বইটা লিখেছে তুই তাদের থেকে বেশি জানিস?"

আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম যে আমি বেশি জানি না। নোট বইটা লিখেছে একজন এক্সপার্ট হেড মাস্টার, আমি এক্সপার্ট হেড মাস্টার থেকে বেশি কেমন করে জানব?

তবে হেড মাস্টাররা যে সব সময় বেশি জানে সেইটা সত্যি নাও হতে পারে। আমাদের স্কুলের যে হেড মাস্টার আছেন সেই মানুষটা খুব বেশি জানেন বলে মনে হয় না। একদিন আমাদের বিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছেন তখন মামুন জিজ্ঞেস করল, "স্যার, জলবিদ্যুৎ কেমন করে তৈরি করে?" মামুন হচ্ছে আমাদের ক্লাস সায়েন্টিস্ট। সে সব সময় সবাইকে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে।

হেড মাস্টার তার দাড়ির মাঝে আঙুল চালিয়ে সেগুলো সোজা করতে করতে বললেন, "জল দিয়ে। অ্যাঁ জল মানে হচ্ছে অ্যাঁ পানি। হিন্দুরা বলে অ্যাঁ জল আমরা বলি অ্যাঁ পানি।" কথার মাঝে অ্যাঁ অ্যাঁ বলা স্যারের অভ্যাস।

"কিন্তু স্যার পানি দিয়ে ইলেকট্রিসিটি কেমন করে তৈরি হয়!"

হেড স্যার বললেন, "এইটাও জানিস না গাধা? অ্যাঁ?"

মামুন মাথা নাড়ল, "না স্যার।"

"উপর থেকে অ্যাঁ যদি পানি ফেলা হয় তখন আমরা অ্যাঁ কী দেখি? অ্যাঁ? আমরা দেখি অ্যাঁ স্পার্ক। স্পার্কটাই হচ্ছে বিদ্যুৎ। অ্যাঁ।"

মামুন ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু স্যার আমরা তো পানি ফেললে স্পার্ক দেখি না।"

হেড স্যার খ্যাক করে উঠলেন, "দেখি না মানে? অ্যাঁ অ্যাঁ? যখন ঝড়বৃষ্টি হয় তখন কোনোদিন অ্যাঁ বিজলি চমকাতে দেখিস নি অ্যাঁ? সেই একই ব্যাপার। অ্যাঁ। বুঝেছিস গাধা কোথাকার?"

মামুন কিছু বুঝে নাই আমরাও কেউ কিছু বুঝি নাই কিন্তু সেটা কারো কাছে সাহস হল না। সবাই মাথা নেড়ে ভান করলাম যে বুঝেছি। তার কয়েকদিন পরে আমাদের স্কুলে একটা অনুষ্ঠানের জন্যে একটা জেনারেটর এনেছে সেটা ভটভট করে বিকট শব্দ করে চলছিল, একজন মানুষ সেখানে কাজ করছিল, মামুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কী?"

মানুষটা বলল, "এইটা জেনারেটর।"

"এইটা দিয়ে কী করে?"

"ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে।"

মামুন জ্ঞানী মানুষের মতো বলল, "জলবিদ্যুৎ তৈরি করলেই তো এইরকম চটচট শব্দ করত না। ওপর থেকে পানি ফেললেই ইলেকট্রিসিটি তৈরি হত।"

শুনে মানুষটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে থাকে। মামুন গরম হয়ে বলল, "আপনি হাসেন কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমি কী বলেছি?"

"তুমি বলেছ যে পানি ঢাললে ইলেকট্রিসিটি হয়। তা হলে তুমি যখন পিশাব করবে তখন সাবধান! অসুবিধা জায়গায় ইলেকট্রিক শক না খেয়ে যাও। হা হা হা।" মানুষটা দাঁত বের করে হাসতেই থাকে।

মামুন বলল, "আমাদের হেড স্যার বলেছেন।"

মানুষটা তার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "তোমার হেড স্যার কাঁচকলা জানে।"

এরকম একটা বেয়াদপ মানুষের সাথে কথা বলাই ঠিক না তারপরেও মামুন চলে গেল না, জিজ্ঞেস করল, "তা হলে ইলেকট্রিসিটি কেমন করে তৈরি হয়?"

"জেনারেটর দিয়ে। চুম্বকের মাঝে কয়েলকে ঘুরাতে হয়।"

"কেমন করে ঘুরায়?"

"মোটর দিয়ে, টারবাইন দিয়ে, গায়ে জোর থাকলে হাত দিয়ে—"

মানুষটা মশকরা করছে কি না আমরা বুঝতে পারলাম না। মামুন আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল কিন্তু বেয়াদপ মানুষটা আমাদের বিদায় করে দিয়ে বলল, "যাও যাও ঝামেলা কর না।"

মামুন হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিস্ট কিন্তু সে আসলে একটু গাধা টাইপের মানুষ। পরের দিন ক্লাসে সে হেড স্যারকে বলল, "স্যার পানি ফেললে ইলেকট্রিসিটি হয় না। ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতে হলে চুম্বকের মাঝে কয়েলকে ঘুরাতে হয়।"

হেড স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী বললি? অ্যাঁ?"

মামুন একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "না মানে—ইয়ে—"

হেড স্যার এগিয়ে এসে বললেন, "অ্যাঁ বেশি বড় মাতবর হয়েছিস?"

মামুন চি চি করে বলল, "না স্যার হই নাই।"

হেড স্যার খপ করে মামুনের কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব অ্যাঁ বেয়াদপ ছেলে। অ্যাঁ!"

কানটা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়েন নাই কিন্তু টেনে যে একটু লম্বা করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। মামুন বেঞ্চে বসে গজগজ করতে লাগল, ফিসফিস করে বলল, "কিছু জানেন না বুঝেন না—আর হয়েছেন হেড মাস্টার!"

কাজেই নোট বই যদিও এক্সপার্ট হেড মাস্টাররা লিখে থাকে কিন্তু তারা যদি আমাদের হেড স্যারের মতো হেড মাস্টার হয়ে থাকেন তা হলে সেগুলো পড়ে কোনো লাভ নেই, আম্মুকে সেই কথা বলাও যাবে না। বাসায় তা হলে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে।

আমার বাসায় যেরকম শান্তি নেই স্কুলে সেরকম শান্তি নেই। লেখাপড়ার মাঝে কোনো আনন্দ নেই কিন্তু স্কুলে লেখাপড়া করতে হয়। লেখাপড়া মানেই হচ্ছে মুখস্থ, বেশি মুখস্থ কম মুখস্থ আর মাঝারি মুখস্থ. মনে হয় মুখস্থ করতে করতে একদিন জানটা বের হয়ে যাবে। আমাদের ক্লাসে শান্তা নামে একটা মেয়ে পড়ে। সে একদিন আমাকে বলল, "বুঝলি ভিতু, আমার সবচেয়ে বেশি রাগ কার উপর?"

"কার উপর?"

"বেগম রোকেয়ার উপর।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন?"

"বেগম রোকেয়াই তো নারী শিক্ষা নারী শিক্ষা বলে আমাদের সর্বনাশ করেছে। যদি না করতো তা হলে আমাদের লেখাপড়া করতে হত না। মুখস্থ করতে হত না। ঘরে বসে দিনরাত টিভি দেখতাম। ইস ভগবান! কী মজাই না তা হলে হত।"

শান্তা মনে হয় কথাটা ভুল বলে নাই। কিন্তু ক্লাসের মেয়েগুলি বেগম রোকেয়ার কারণেই হোক আর অন্য কারণেই হোক লেখাপড়া করতে এসে আমাদের ঝামেলা করে দিয়েছে। স্যার ম্যাডামরা যখন যে হোমওয়ার্ক করতে দেন তারা সেগুলো ঠিকঠাক করে আনে আর সেজন্যে আমাদের বকাবকি শুনতে হয়। বকাবকি আমি মোটামুটি সহ্য করে ফেলি কিন্তু যখন খপ করে কান ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দেন কিংবা একটা বেত দিয়ে হাতের মাঝে সপাং সপাং

আমারবই.কম amarboi.com

করে মারতে থাকেন তখন সেটা সহ্য করতে পারি না, যতটুকু ব্যথা লাগে তার থেকে বেশি লাগে অপমান।

আমাদের স্কুলের বিল্ডিংটা অনেক বড়, অনেক ক্লাস রুম, অফিস, সামনে বড় মাঠ কিন্তু কোনোখানে কোনো আনন্দ নেই। একটা বড় লাইব্রেরি আছে কিন্তু সেটা সব সময় তালা মারা থাকে। জানালার ফাঁক দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি, সারি সারি আলমারি বোঝাই বই, কিন্তু আমরা কোনোদিন সেই আলমারির বইগুলি ছুঁয়েও দেখতে পারি নি। একদিন আমি সাহস করে আমাদের বাংলা স্যারকে বললাম, "স্যার। আমাদের লাইব্রেরিতে আমরা যেতে পারি না স্যার?"

স্যার বললেন, "কী বললি?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "লাইব্রেরি—"

"লাইব্রেরি? কী হয়েছে লাইব্রেরির?"

"আমরা লাইব্রেরিতে যেতে পারি না স্যার?"

স্যার অবাক হয়ে বললেন, "কেন? লাইব্রেরিতে কেন যাবি?"

"বই পড়তে।"

"বই পড়তে? পড়ার বই নাই? তোর পাঠ্য বই নাই? গাইড বই নাই?"

"আছে স্যার। কিন্তু লাইব্রেরি থেকে অন্য বই পড়তে চাচ্ছিলাম।"

স্যার চোখ পাকিয়ে বললেন, "আউট বই? আউল ফাউল বই?"

মামুন তখন আমাকে সাহায্য করার জন্যে বলল, "অন্য বইও পড়া যায় স্যার। জ্ঞান বিজ্ঞানের বই। মহাকাশের বই।"

আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে চালাকচতুর মেয়ে হচ্ছে রিতু, সে বলল, "কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের বইও পড়া যায়।"

বাংলা স্যার তো আর কাজী নজরুল ইসলাম আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে বাজে কথা বলতে পারেন না, তাই মুখ শক্ত করে বললেন, "তোদেরকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেই আর তোরা বই চুরি করে লাইব্রেরিটা শেষ করে দিস?"

আমি বললাম, "কেন স্যার? বই চুরি করব কেন?"

শান্তা বলল, "আমরা বই পড়ব।"

"আমি তোদের খুব ভালো করে চিনি, তোরা হচ্ছিস পাজি বদমাইশ আর চোর। সবাই একজন করে চোর। কেউ ছোট চোর কেউ বড় চোর। সুযোগ পেলেই তোরা বই চুরি করবি।"

স্যারের কথা শুনে আমার খুবই রাগ হল, আমি বললাম, "যদি আমাদেরকে লাইব্রেরিতে ঢুকতে না দেন তা হলে স্কুলে লাইব্রেরিটা আছে কেন?"

স্যার একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমার তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে লাইব্রেরিটা কেন আছে?"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "না স্যার—মানে স্যার—"

স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, "পাঠ্য বই পড়ার মুরোদ নাই উনি লাইব্রেরি থেকে আউট বই পড়বেন। শখ দেখে বাঁচি না। বড় হয়ে হবি একটা সন্ত্রাসী না হলে ঘুষখোর কেরানি, আর লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়বি? নিজের কাজ করে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না আর এখন লাট সাহেবের বাচ্চার জন্যে আমায় লাইব্রেরি খুলে দিতে হবে। বদমাইশ ছেলে। জুতিয়ে তোকে লম্বা করে দেওয়া দরকার, জিব টেনে ছিড়ে ফেলা দরকার—"

আমার কপালটা খুবই ভালো স্যার শুধু গালিগালাজ করেই শান্ত হলেন, আমাকে পিটালেন না। বাংলা স্যার যখন পিটানো শুরু করেন তখন সেটা হয় ভয়ংকর। মাসুমের কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন চড় মেরে। লাইব্রেরির কথা বলা খুবই ভুল হয়েছে—আমি জন্মে আর লাইব্রেরির কথা বলব না। মরে গেলেও না।

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিটা সব সময়েই বন্ধ থাকবে। আমরা জানালার ফাঁক দিয়ে বড় বড় আলমারি বোঝাই বইগুলির দিকে তাকিয়ে থাকব আর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলব।

কিন্তু একদিন খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। আমরা স্কুলের মাঠে খেলছি, খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন খেলা বন্ধ করে আমরা বাসায় রওনা দিয়েছি। হঠাৎ মাসুম বলল, "ঐ দেখ।"

আমরা মাসুমের সাথে সাথে স্কুল বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালাম। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আমরা সবাই এই ঘরটাকে চিনি। এটা আমাদের লাইব্রেরি ঘর। নিচ থেকে ভালো বোঝা যায় না কিন্তু মনে হল ভেতরে একজন মানুষ ঘোরাঘুরি করছে। মামুন বলল, "লাইব্রেরির ভিতরে কে যেন ঢুকেছে।"

আমি বললাম, "মনে হয় ভূত।"

"ভূত? ভূত কেন হবে?"

আমারবই.কম amarboi.com

"লাইব্রেরিতে ভূত ছাড়া আর কে ঢুকবে।"

মামুন একটু বৈজ্ঞানিক ধরনের হলেও অন্য সব দিকে সে গাধা টাইপের মানুষ তাই সে গাধার মতো বলল, "মনে হয় লাইব্রেরিটা পরিষ্কার করছে, এখন সেটা আমাদের জন্যে খুলে দেবে আর আমরা বই নিতে পারব।"

তার কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। মাসুম বলল, "গাধা কোথাকার। ক্লাসে আমাদের ব্যাগে গল্প বই পাওয়া গেলে আমাদের পিটিয়ে লম্বা করে দেয় আর লাইব্রেরি খুলে দেবে গল্প বই পড়ার জন্যে? তুই আসলেই গাধা।"

মামুন মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল সে গাধা। আমরা তাই তাকে নিয়ে আর বেশি টিটকারি দিলাম না।

২
যখন নূতন ম্যাডাম এসে আমাদের স্কুলটাকে একেবারে অন্যরকম করে ফেললেন

এসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম আমাদের হেড মাস্টার নাই তার জায়গায় একজন কমবয়সী ছোটখাটো শুকনো গাতলা হাসিখুশি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। সোনার বাংলা গান গেয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হল, আমরা দেখলাম, কমবয়সী ছোটখাটো হালকাপাতলা হাসিখুশি মহিলাটি খুব উৎসাহ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পুরো গানটা গাইলেন। কী আশ্চর্য! এর আগে আমাদের স্যার ম্যাডামরা কখনো সোনার বাংলা গান গায় নি—পুরোটা তারা জানে কি না আমার সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এরপর আমাদের বাংলা স্যার একটু এগিয়ে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "তোমরা হয়তো এখনো খবর পাও নি যে আমাদের হেড মাস্টার স্যার বদলি হয়ে গেছেন। তার জায়গায় দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন ড. রাইসা খালেদ। আমি রাইসা খালেদকে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করছি।"

কমবয়সী ছোটখাটো হালকাপাতলা হাসিখুশি মহিলাটা একজন ডাক্তার—আবার আমাদের হেড মাস্টার। কী আশ্চর্য! আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, দেখলাম মহিলাটা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হেসে বললেন, "আমি আসলে পরশু দিন দায়িত্ব নিয়েছি—তারপর দুই দিন স্কুল বন্ধ তাই তোমাদের সাথে দেখা হয় নি! আজকে প্রথম দেখা হল।" ভদ্রমহিলা বড় বড় চোখ করে আমাদের সবার দিকে তাকালেন, আমরাও বড় বড় চোখ করে তার দিকে

আমারবই.কম amarboi.com

"সেটা লেখা আছে তার কারণ আমি একটা পিএইচডি করেছি। কেউ পিএইচডি করলে তাকে ডক্টর বলে।"

রিতু মাথা নেড়ে বলল, "ও বুঝেছি! বিএ এমএ যেরকম সেরকম পিএইচডি।"

"হ্যাঁ।" ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "সেরকম।"

"ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেরকম ডক্টর সেরকম ডক্টর—"

ম্যাডাম হেসে ফেললেন, বললেন, "হ্যাঁ। তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক বড় মানুষ। জ্ঞানী মানুষ—তার সাথে আমার তুলনা কর না, সেটা ঠিক হবে না।"

রিতু আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ম্যাডাম তার আগেই সুজন আর বজলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন তোমরা দুইজন বল তোমাদের কী বলার আছে?"

কারো কাছে কিছু বলার নেই। দুইজনেই বোকার মতন একটু হাসার চেষ্টা করল। ম্যাডাম বললেন, "একজন আরেকজনের সাথে হ্যান্ডশেক করে বল, আমি দুঃখিত। আমি আর কোনোদিন মারামারি করব না। বল।"

দুজনেই একটু গাঁইগুঁই করে শেষে একজন আরেকজনের হাত ধরে বলল, "আমি দুঃখিত। আমি আর মারামারি করব না।"

কয়েকদিনের মাঝেই আমাদের নূতন ম্যাডাম অনেক বিচিত্র বিচিত্র কাজ করে ফেললেন। কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র কাজটার কথা আমরা জানলাম মাসখানেক পরে।

৩

যখন আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল সম্পূর্ণ অন্যরকম একজন যার কারণে আমাদের পুরো ক্লাসটাই হয়ে গেল একটু অন্যরকম

আমরা ক্লাসে বসে আছি, বাংলা স্যার রোল কল শেষ করে বইটা হাতে নিয়েছেন তখন আমরা দেখতে পেলাম করিডোর ধরে নূতন ম্যাডাম হেঁটে আসছেন। তার পিছনে একজন মানুষ আর মানুষটার পিছনে একটা মেয়ে। মেয়েটা নিশ্চয়ই একটু নেকু টাইপের, এতো বড় হয়েছে কিন্তু এখনো তার আব্বুর হাত ধরে হাঁটছে।

নূতন ম্যাডাম আমাদের ক্লাসের দরজার পাশে দাঁড়ালেন, বললেন, "আমরা ভেতরে আসতে পারি?"

বাংলা স্যার মাথা ঘুরিয়ে নূতন ম্যাডাম, তার সাথে বাবা আর মেয়েকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আসেন। আসেন।"

নূতন ম্যাডাম, বাবা আর সেই মেয়েটি ক্লাসে এসে ঢুকল। মেয়েটা এখনো তার বাবার হাত ধরে রেখেছে। খুব সুন্দর কাপড় পরে আছে, দেখে মনে হল একটু অহংকারী। কেউ নূতন জায়গায় এলে চারিদিকে তাকায়, সবাইকে লক্ষ্য করে—এই মেয়েটা সেরকম কিছুই করল না, কেমন জানি সোজা সামনে তাকিয়ে রইল।

নূতন ম্যাডাম আমাদের সবাইকে মাথা ঘুরিয়ে একবার দেখলেন, তারপর বললেন, "তোমাদের ক্লাসে একজন নূতন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। আমি তাকে নিজে নিয়ে এসেছি। সাথে তার বাবাও আছেন।"

বাবা তখন একটু হাত নেড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। ম্যাডাম বললেন, "ছাত্রীটির নাম মাইশা হাসান। ডাকনাম আঁখি।

আমারবই.কম amarboi.com

আঁখি তোমাদের দশজনের থেকে একটু অন্যরকম। আমি ইচ্ছে করলে আগে থেকে তোমাদের সেটা জানাতে পারতাম—ইচ্ছে করে জানাই নি। তোমাদের ক্লাসে তোমরা আঁখিকে ঠিকভাবে গ্রহণ করো।"

আমরা ম্যাডামের কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম না। তাকে দেখে মোটেও অন্যরকম মনে হচ্ছে না—বাড়তি হাত পা নেই একেবারে স্বাভাবিক। ক্লাসে ভর্তি হয়েছে সে আর দশজনের মতো ক্লাস করবে—তাকে আবার গ্রহণ করব কেমন করে? তার গলায় কী ফুলের মালা দিতে হবে? নাকি তার জন্যে গান গাইতে হবে?

নূতন ম্যাডাম মেয়েটার বাবাকে নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেন। বাংলা স্যার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মেয়েটাও ক্লাস রুমের দিকে তাকিয়ে রইল। স্যার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "যাও। বস।"

মেয়েটা বলল, "কোথায়?"

শান্তা একটু সরে তার পাশে জায়গা করে দিয়ে বলল, "এইখানে।"

মেয়েটা তার ব্যাগটা খুলে সাদা মতো কী একটা বের করল, সেটা ছেড়ে দিতেই খুলে একটা সাদা লাঠি হয়ে গেল। মেয়েটা সেই লাঠিটা মেঝেতে লাগিয়ে ডানে বামে একটু নাড়িয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে শান্তার বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল—এবং তখন হঠাৎ করে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম এই মেয়েটা চোখে দেখতে পায় না। নিজের অজান্তেই আমরা সবাই একটা চাপা শব্দ করলাম।

মেয়েটা খুব শান্ত ভঙ্গিতে এসে শান্তার পাশে বসে পড়ল, তারপর হাতের সাদা লাঠিটা ভাঁজ করে তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো কিছু দেখছে না কিন্তু তাকিয়ে আছে, কী আশ্চর্য!

বাংলা স্যারও কেমন যেন অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমরা যেরকম জানি না এই স্যারও জানেন না—তাই খানিকক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখে আমতা আমতা করে বললেন, "তু-তু-তুমি অন্ধ?"

মেয়েটা বলল, "আমি চোখে দেখতে পাই না।" কথা শুনে মনে হল অন্ধ আর চোখে দেখতে না পাওয়া দুটি পুরোপুরি ভিন্ন জিনিস। উচ্চারণটা খুব সুন্দর মনে হয় কেউ টেলিভিশনে খবর পড়ছে।

বাংলা স্যার বললেন, "তুমি যদি চোখে না দেখো তা হলে পড়ালেখা করবে কেমন করে?"

"ব্রেইল বই পাওয়া যায়।"

"কী বই?"

"ব্রেইল। হাত দিয়ে ছুঁয়ে পড়তে হয়।"

"পরীক্ষা? পরীক্ষা দিবে কেমন করে।"

"আমি বলব আর একজন লিখে দেবে।"

স্যারের মুখে বিদঘুটে একটা হাসি ফুটে উঠল, "খ্যাক" ধরনের একটা শব্দ করে বললেন, "ধুর। এইভাবে লেখাপড়া হয় নাকি! আর তোমার লেখাপড়া করে কী লাভ? তুমি কি ডাক্তার হবে না ইঞ্জিনিয়ার হবে? ভালো মানুষেই চাকরি পায় না কানা ল্যাংড়া লুলা মানুষকে কে চাকরি দিবে?"

আমি তখন বুঝতে পারলাম কেন নূতন ম্যাডাম গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। বাংলা স্যার যেটা করছেন সেটা যেন না হয় সেটাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। যেটা করার কথা না বাংলা স্যার ঠিক সেইটাই করছেন। তাকে কেমন করে থামানো যায় বুঝতে পারলাম না। স্যার মনে হল আরো নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন, হাত পা নাড়িয়ে বললেন, "চোখ হাত পা ঠ্যাং আছে এরকম ছেলেমেয়েদের পড়াতেই আমার জান তামা হয়ে যায় এখন যদি চোখ হাত পা ঠ্যাং নাই কানা ল্যাংড়া আঁতুড়কে পড়াতে হয় তা হলে আমি কেমন করে পড়াব? আমার কি এতো সময় আছে?"

আমরা সবাই দেখলাম নূতন মেয়েটার দুই গাল লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠল। আমাদেরও মনে হল লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই। স্যার দাঁত মুখ খিচিয়ে বললেন, "বোবা কালা অন্ধদের স্পেশাল স্কুল আছে না?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "আছে।"

"তুমি সেই স্কুলে পড় না কেন?"

"আমি সেইরকম স্কুলেই পড়তাম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এখন সারা পৃথিবীতেই সব রকম প্রতিবন্ধীদের সাধারণ স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করা হয়। সেইজন্যে—"

বাংলা স্যার কেমন যেন খেপে উঠলেন, বললেন, "সেইজন্যে এইটা আমাদের স্কুলে শুরু করতে হবে? যতরকম পাগলামি-ছাগলামি সব এই স্কুলে? সব ঝামেলা আমাদের উপর? আমাদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই?" স্যার একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "আমি যখন ক্লাসে পড়াব তুমি সেটা কেমন করে ফলো করবে?"

আমারবই.কম amarboi.com

"আমি সেটা শুনতে পাই। তা ছাড়া আমি রেকর্ড করি—"

"কী কর?"

"আমার একটা ক্যাসেট প্লেয়ার আছে, আমি সেটাতে সবকিছু রেকর্ড করি।"

বাংলা স্যার এবারে কেন জানি একটু থতমত খেয়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "রেকর্ড কর?"

"হ্যাঁ।"

"আমি যখন ক্লাস নেয়া শুরু করব তখন তুমি রেকর্ড করা শুরু করবে?"

"আমি ক্লাসে আসার পরই রেকর্ড করা শুরু করেছি।"

বাংলা স্যার এবারে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে মানে আমি এতক্ষণ যা যা বলেছি সব রেকর্ড হয়ে গেছে?"

"জি স্যার।" মেয়েটা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল, "আসলে স্যার আমি এই স্কুলে আসতে চাই নি। আমি আমাদের স্কুলেই খুব ভালো ছিলাম। কিন্তু ডক্টর রাইসা জোর করলেন তাই এসেছি। রাইসা ম্যাডাম বলেছেন ছয় মাস দেখতে। যদি ছয় মাসে ঠিকভাবে কাজ না করে তা হলে আমার স্কুলে ফিরে যাব।"

মেয়েটা তার ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা ছোট লাঠিটা বের করল, ছেড়ে দিতেই সেটা লম্বা হয়ে গেল। লাঠিটা মেঝেতে ছুঁইয়ে সে বলল, "স্যার আসলে ছয় মাস লাগবে না, আমি কিছুক্ষণেই বুঝে গেছি এটা কাজ করবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি যাই।"

বাংলা স্যার আমতা আমতা করে বললেন, "আর ইয়ে—মানে রেকর্ডিং—"

"সেটা শুনলে কেউ আর আমাকে জোর করবে না।"

মেয়েটা তার ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আমার আব্বু নিশ্চয়ই এখনো চলে যান নাই।" মেয়েটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সরি যে আমার জন্যে তোমাদের এতো সময় নষ্ট হল। প্লিজ তোমরা কিছু মনে কোরো না।"

মেয়েটা যখন ঠিক দরজার কাছে গিয়েছে তখন আমার কী হল কে জানে আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে বললাম, "দাঁড়াও।"

আমারবই.কম amarboi.com

আর কী আশ্চর্য, পুরো, ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে একসাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "দাঁড়াও। দাঁড়াও!"

রিতু আর শান্তা আর মামুন মেয়েটার দিকে ছুটে গেল। রিতু খপ করে মেয়েটার হাত ধরে বলল, "না তুমি যেতে পারবে না। তুমি আমাদের সাথে পড়বে।"

শান্তাও তাকে ধরে ফেলল, বলল, "হ্যাঁ পড়বে। আমাদের সাথে পড়বে। তোমাকে আমরা যেতে দেব না।"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে ছুটে যেতে থাকে, চারিদিক দিয়ে মেয়েটাকে ঘিরে ফেলল, সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করে বলতে লাগল, "যেতে দেব না। যেতে দেব না। আমাদের সাথে পড়তে হবে। পড়তে হবে।"

আমি খুব কাছে থেকে মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিলাম, মেয়েটার চোখ দুটো কী সুন্দর, একেবারে ঝকঝক করছে, কিন্তু সে এই চোখ দুটো দিয়ে তাকাতে পারে কিন্তু দেখতে পারে না। আমি দেখলাম তার চোখ দুটোতে পানি টলটল করছে, সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফিসফিস করে বলল, "থ্যাংকু। তোমাদের অনেক থ্যাংকু।"

মেয়েটা হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু ছেলেমেয়েরা তাকে আটকে রাখল, রিতু বলল, "আমরা তোমাকে যেতে দেব না। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, আমরা তোমার সবকিছুতে সাহায্য করব। তোমার কোনো সমস্যা হবে না।"

শান্তা বলল, "আমরা তোমার পাশে বসব, স্যারেরা বোর্ডে কিছু লিখলে সেটা তোমাকে পড়ে শোনাব।"

সুজন বলল, "পরীক্ষার সময় তুমি বলবে আমি লিখে দিব।"

মেয়েটা বলল, "কিন্তু আমি তো এখানে থাকতে পারি না।"

সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, "কেন? কেন পার না?"

"তোমরা তো জান কেন পারি না। তোমরা তো দেখেছ, শুনেছ। তোমরাই বল, এরপর আমি কি এখানে থাকতে পারি? থাকা উচিত?"

আমরা কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমাদের মাঝে রিতু সবচেয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে সবাই তার দিকে তাকালাম, তখন রিতু মেয়েটার হাত ধরে বলল, "কিন্তু তুমি আমাদের কথাটা একটু ভাববে না? তুমি যদি আজকে চলে

যাও সারাটা জীবন আমাদের মনে কষ্ট থাকবে যে তোমার মতন একটা সুইট মেয়েকে আমরা আমাদের ক্লাসে রাখতে পারি নি। বল, তুমি কি একজনের জন্যে আমাদের সবার মনে সারা জীবন কষ্ট দিবে? বল?"

মেয়েটা কোনো কথা বলল না। আমার মনে হল রিতুর পা ধরে সালাম করে ফেলি, রিতুর মতন পুঁচকে একটা মেয়ে এতো সুন্দর করে কথা বলা শিখল কেমন করে? সুজন গলা নামিয়ে বলল, "দরকার হলে তুমি থাকবে। আমরা ঐ স্যারকে বিদায় করে দিব।"

অনেকেই সুজনের কথা শুনে মাথা নাড়ল, মাসুম বলল, "আমার কানের পর্দা ফাটিয়েছিলেন মনে নাই? এতোদিন কিছু বলি নাই, এখন দরকার হলে হাইকোর্টে মামলা করে দিব—"

বাংলা স্যার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না, ঠিক কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আমতা আমতা করে বললেন, "ইয়ে মানে তোমরা সবাই নিজের জায়গায় গিয়ে বস—"

আমরা নিজের জায়গায় বসার কোনো আগ্রহ দেখালাম না, মেয়েটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমাদের ক্লাসের হট্টগোল শুনে পাশের ক্লাস থেকে স্যার আর ম্যাডামরা বের হয়ে এলেন, ছাত্রছাত্রীরা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। তখন রিতু আর শান্তা মেয়েটাকে দুই পাশ থেকে ধরে রীতিমতো টেনে ক্লাসের ভেতর ফিরিয়ে আনল।

বাংলা স্যার তার শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বললেন, "ব্যস অনেক হয়েছে। এখন সবাই চুপ কর। চুপ।"

আমরা চুপ করলাম না, ক্লাসের ভেতরে নিজেদের ভিতরে গুনগুন করে কথা বলতে লাগলাম। স্যার আবার দুর্বল গলায় বললেন, "চুপ।" কিন্তু কেউ চুপ করল না।

তখন রিতু উঠে দাঁড়াল, বলল, "স্যার।"

সাথে সাথে সারা ক্লাস চুপ করে গেল। স্যার একবার ঢোক গিলে বললেন, "কী হয়েছে।"

"আজকে আমাদের সাথে একজন নূতন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। সে স্যার, মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিল। আমরা অনেক কষ্ট করে তাকে ফিরিয়ে এনেছি।"

"তাতে কী হয়েছে?"

আমারবই.কম amarboi.com

"আমরা চাই না সে মন খারাপ করে থাকুক।"

ক্লাসের অনেকেই মাথা নাড়ল। বলল, "জি স্যার, চাই না।"

"তা হলে কী করতে হবে?"

"আমরা স্যার নিরিবিলি তার সাথে কথা বলতে চাই।"

স্যার একবার ঢোক গিললেন, "নিরিবিলি?"

রিতু মাথা নাড়ল, বলল, "জি স্যার। আমরা আমরা নিজেরা। আপনি স্যার এই পিরিয়ডটা ছুটি দিয়ে দেন?"

"ছুটি?" স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, "ছুটি?"

আমরা সবাই বললাম, "জি স্যার ছুটি।"

স্যার এবারে কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন, তখন সুজন দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার আপনি যদি চান তা হলে আমরা হেড ম্যাডামের কাছ থেকে পারমিশান আনতে পারি। ক্লাসে কী হয়েছে সেটা বললেই ম্যাডাম নিশ্চয়ই রাজি হবেন—"

স্যার এবারে কেমন যেন খাবি খাওয়ার মতো ভান করলেন, বললেন, "না–না তার দরকার নাই। আ–আমি ছুটি দিচ্ছি। কিন্তু তোরা ক্লাসে কোনো গোলমাল করতে পারবি না।"

আমরা সবাই একসাথে চিৎকার করে প্রচণ্ড গোলমাল করে বললাম, "করব না স্যার। গোলমাল করব না।"

স্যার হাত তুলে বললেন, "আস্তে আস্তে!" তারপর টেবিল থেকে রেজিস্টার খাতা, বই, চক আর ডাস্টার নিয়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা তখন আরো একবার আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

স্যার ক্লাস থেকে বের হওয়া মাত্রই রিতু ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "সবাই চুপ। কোনো গোলমাল করবি না।"

আমরা এবারে চুপ করে বসে পড়লাম, রিতু তখন মেয়েটার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে সামনে নিয়ে আসে। তারপর বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, "প্রিয় ভাই ও বোনেরা। আজকে আমাদের সাথে একজন নূতন ছাত্রী পড়তে এসেছে। আরেকটু হলে সে মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিল। আমরা অনেক কষ্ট করে তাকে ফিরিয়ে এনেছি। আমরা এখন আমাদের এই নূতন বন্ধুকে আমাদের উদ্দেশে কিছু বলতে বলব।"

মেয়েটা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, বলল, "বলব? আমি?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলব?"

"তোমার যেটা ইচ্ছা।"

"আমি কখনো এভাবে কিছু বলি নাই। আমি কিছু বলতে পারব না।"

"পারবে। পারবে।" আমরা টেবিলে থাবা দিয়ে বললাম, "শুরু কর।"

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে তখন শুরু করল, "ইয়ে—মানে আমার নাম হচ্ছে—মাইশা হাসান। আমার ডাকনাম হচ্ছে আঁখি।" মেয়েটা একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আঁখি মানে হচ্ছে চোখ। আমার আব্বু আম্মু যদি আগে জানত তা হলে আমার মনে হয় কখনোই আমার নাম আঁখি রাখত না। অন্য কিছু রাখত।"

সুমি সাধারণত কথা বলে না, হঠাৎ করে সে বলল, "তোমার চোখগুলো দেখতে খুব সুন্দর। আঁখি নামটা মনে হয় ঠিকই আছে।"

সুজন বলল, "তোমার চোখ তো একেবারে ঠিক আছে। তুমি সত্যি দেখতে পাও না?"

"না।"

"একটুও না? হালকা হালকা?"

"না।"

"খুব দামি চশমা কিনে দিলে—"

আঁখি হেসে ফেলল, বলল, "আমার চোখের সবকিছু ঠিক আছে। যেটা নষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ। রেটিনা থেকে কোনো সিগন্যাল ব্রেন পর্যন্ত যায় না। সেজন্যে আমি কিছু দেখি না।"

"কোনো চিকিৎসা নাই?"

"যেটুকু ছিল করা হয়েছে। লাভ হয় নি।"

ক্লাসের সবাই জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করল, কেউ নিঃশ্বাস ফেলল, যাদের মায়া বেশি, তারা বলল, "আহারে।" আঁখি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে, সে মুখ তুলে বলল, "তোমরা আমার জন্যে কিছু একটা করতে চাইছ?"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি কী চাই, তোমাদেরকে বলব?"

"বল।"

"আমি চাই তোমরা সবাই ভুলে যাও যে আমি চোখে দেখতে পাই না। আমি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী কিংবা অন্ধ অথবা ব্লাইন্ড। আমি চাই তোমরা আমাকে অন্য

আমারবই.কম amarboi.com

আরেকজনের মতো নাও! আমি চাই তোমরা কেউ আমার জন্যে আলাদা করে কিছু না কর—"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তোমার ঝামেলা হবে না?"

"হবে। অনেক ঝামেলা হবে। অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু যখন কেউ আমাকে মায়া করে, আমাকে দেখে দুঃখ পায়, আহা উহু করে তখন আমার আরো অনেক বেশি কষ্ট হয়।"

আমরা সবাই চুপ করে বসে রইলাম, এরকম একটা ব্যাপার থাকতে পারে আমরা কখনোই চিন্তা করি নি। কেন জানি ধরেই নিয়েছিলাম সব সময়েই বুঝি সবাইকে গায়ে পড়ে সাহায্য করতে হয়। কখনো কখনো কাউকে সাহায্য না করাটাই হচ্ছে তাকে সাহায্য করা। কী আশ্চর্য!

রিতু বলল, "ঠিক আছে আঁখি, আমরা সবাই ভুলে যাব যে তুমি চোখে দেখতে পাও না! আমরা সবাই সব সময় তোমার সাথে এমন ব্যবহার করব যেন তুমি আমাদের মতো একজন!"

"ভেরি গুড। থ্যাংকু।"

"ঠিক আছে।" রিতু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা সবাই ভুলে যা। ওয়ান টু থ্রি!"

আমরা সবাই বললাম, "ওয়ান টু থ্রি।" তারপর ভান করলাম আমরা ভুলে গেছি। রিতু তখন আঁখির দিকে তাকিয়ে বলল, "আঁখি, তুমি আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছ এখন তোমার এই ক্লাসের ছেলেমেয়ের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার। সবার আগে আমার সাথে পরিচয় হোক। আমাকে দেখছ?"

আঁখি বলল, "দেখছি।"

"বল দেখি আমি দেখতে কী রকম?"

"তুমি কালো এবং মোটা এবং তোমার নাকের নিচে ছোট ছোট গোঁফ।"

আমরা সবাই হি হি করে হাসতে লাগলাম, রিতু হাসল সবচেয়ে বেশি এবং হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। সুজন দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কী রকম?"

"তোমার মাথা ন্যাড়া। তোমার গলায় সোনার চেন।"

সুজনের সাথে সাথে আমরা সবাই হি হি করে হাসতে লাগলাম।

শান্তা বলল, "আমি?"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার নাকের উপর দিয়ে একটা ট্রাক চলে গিয়েছে—তাই নাকটা চ্যাপ্টা।"

আমরা সবাই হি হি করে হাসতে লাগলাম তখন রিতু আবার আমাদের থামাল, বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আঁখি যে খুবই ভালো দেখতে পায় সেটা নিয়ে এখন আমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই। এখন তোমার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এই যে আমি, কালো মোটা এবং নাকের নিচে গোঁফ আমার নাম হচ্ছে রিতু। মনে থাকবে? রি-তু।"

"মনে থাকবে।"

শান্তা বলল, "আমার নাম শান্তা।"

সুমি বলল, "আমার নাম সুমি।"

সুজন বলল, "আমার নাম সুজন।"

এভাবে সবাই তার নাম বলল আঁখি খুব মনোযোগ দিয়ে নামগুলো শুনল। আমি যখন বললাম, "আমার নাম তিতু।" তখন সবাই চিৎকার করে বলতে লাগল, "তিতা তিতা।"

আঁখি তাদের চিৎকারে কান দিল না, বলল, "তিতু।"

টিফিনের ছুটিতে আমরা ক্লাস থেকে বের হয়েছি তখন উঁচু ক্লাসের একটা ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তোদের ক্লাসে নাকি একটা অন্ধ মেয়ে ভর্তি হয়েছে?"

আমি অবাক হওয়ার ভান করলাম, "তাই নাকি?"

"তুই জানিস না?"

"একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে; কিন্তু অন্ধ কি না সেটা খেয়াল করি নাই।"

ছেলেটা মামুনকে জিজ্ঞেস করল, "তুই জানিস না?"

মামুন ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "নাহ্। জানি না তো।"

রাতে খাবার টেবিলে আমি বললাম, "আজকে আমাদের ক্লাসে নূতন একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে।"

সবাই আমার দিকে তাকাল, এরপরে কী বলব সেটা শোনার জন্যে। আমি বললাম, "মেয়েটা খুবই ফানি। রিতুকে দেখে বলে সে নাকি কালো আর মোটা আর নাকের নিচে গোঁফ।" আমি কথা শেষ করে হি হি করে হাসলাম।

আমারবই.কম amarboi.com

ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, "রিতু মেয়ে না? মেয়েদের গোঁফ থাকে নাকি?"

"নাই। রিতু চিকন-চাকন ফর্সা।"

"তা হলে?"

"বললাম না মেয়েটা খুব ফানি।"

ভাইয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই খুবই আজব।"

আব্বু আর আম্মু কিছু বললেন না, কিন্তু তাদের মুখ দেখে বোঝা গেল তারাও সেটাই ভাবছেন। আমি খুবই আজব!

৪

যখন আমরা অভ্যস্ত হলাম আঁখির সাথে আর আঁখি অভ্যস্ত হল আমাদের সাথে

আমরা কয়েকদিনের মাঝেই আঁখিকে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। প্রথমদিন বাংলা স্যার তার সাথে যেরকম খারাপ ব্যবহার করেছিলেন অন্য কোনো স্যার আর ম্যাডাম তার সাথে এরকম ব্যবহার করার চেষ্টা করেন নি। অন্য স্যার ম্যাডামেরা খুব ভালো তা নয়—কেউ কেউ আরো অনেক বেশি ভয়ংকর ছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের নূতন ম্যাডাম ব্যাপারটা টের পেয়ে আগে থেকে সবাইকে ভালো মতন টিপে দিয়েছিলেন। ক্লাসে এসে সবাই ভান করতে লাগলেন চোখে দেখতে পায় না এরকম একটা মেয়ে ক্লাসে থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আঁখি সব সময় সামনের বেঞ্চে বসত, আমি সব সময় বসতাম পিছনে। পিছনে বসলে স্যার ম্যাডামের চোখের আড়ালে থাকা যায়, তাদের যখন হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্ন করার ঝোঁক হয় তখন সামনের জনের পিছনে লুকিয়ে যাওয়া যায়। একদিন একটু আগে ক্লাসে এসে দেখি এর মাঝে আঁখি এসে তার জায়গায় বসে পা দুলাচ্ছে। আমি ঢুকতেই বলল, "তিতু, আজ এতো সকালে এসেছ!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি কীভাবে বুঝলে আমি তিতু।"

আঁখি হাসল, "এটা হচ্ছে খোদার একধরনের খেলা—চোখে যখন দেখতে দিচ্ছি না তা হলে কানে বেশি করে শুনতে দেই।"

"কিন্তু আমি তো কোনো কথা বলি নাই।"

"তাতে কী হয়েছে! আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাই। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই।"

আমারবই.কম

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম, "তুমি আমার পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছ আমি কে?"

"হ্যাঁ তুমি যেভাবে শব্দ করে পা ঘষতে ঘষতে হাঁটো তোমার হাঁটার শব্দ শুনলে যে কেউ দুই মাইল দূর থেকে বুঝতে পারবে তুমি কে?"

আমি কখনো জানতাম না যে আমি শব্দ করে পা ঘষতে ঘষতে হাঁটি। আঁখি হাসি হাসি মুখ করে বলল, "পিছনে গিয়ে বসবে?"

"হ্যাঁ।"

"সাহসী বীর।"

"তুমি ভাবছ আমি সামনে বসতে ভয় পাই?"

"বসে দেখাও।"

কাজেই আমাকে সামনের বেঞ্চে বসতে হল। আমি আঁখির পাশেই বসলাম। আঁখির পাশে বসে আমি আবিষ্কার করলাম সে যদিও চোখে দেখতে পায় না কিন্তু কানে আশ্চর্য রকম সূক্ষ্ম শব্দ শুনতে পায়। যেরকম বজলু ক্লাসে ঢোকার অনেক আগেই সে বলল, "বজলু আসছে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি কেমন করে বুঝলে?"

"ওর জ্যামিতি বক্সটা ঝুনঝুন শব্দ করে।" আমি বজলুর পাশে থেকেও তার জ্যামিতি বক্সের ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পেলাম না। যখন শান্তা ক্লাসে ঢুকল তখন আঁখি বলল, "শান্তা চুইংগাম খাচ্ছে।" মানুষ চুইংগাম খেলে যে শব্দ হয় আমি সেটাও আগে জানতাম না। আমি সবচেয়ে অবাক হলাম যখন তার সাথে কথা বলতে বলতে দেখলাম হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"মা পাখিটা এসেছে।"

"মা পাখি? কোথায়?"

"আমি পিছনের জানালায় একটু চাল রেখেছি। মা পাখিটা তার বাচ্চাকাচ্চাকে নিয়ে সেগুলো খেতে এসেছে।"

"চাল? তুমি চাল এনেছ?"

"হ্যাঁ পাখির শব্দ শুনেছিলাম তো, তাই ব্যাগে করে প্রত্যেক দিন একটু চাল নিয়ে আসি। জানালার কাছে রাখি। একটা মা পাখি আর তার দুইটা বাচ্চা সেটা খেতে আসে।"

আমি আঁখির কথা বিশ্বাস করলাম না, তাই উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখতে হল, সত্যিই কয়েকটা পাখি কিচিরমিচির করছে। এর মাঝে কোনটা মা

পাখি কোনটা বাচ্চাকাচ্চা পাখি বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে পাখিগুলো শব্দ করে উড়ে গেল।

আমি যখন আঁখির কাছে ফিরে এলাম সে জানতে চাইল, "পাখিগুলো দেখতে কীরকম?"

"কালো রংয়ের। লম্বা লেজ।"

"বাচ্চাগুলো কত বড়?"

"কী জানি—কোনটা বাচ্চা কোনটা মা বুঝতে পারলাম না।"

"ঠোঁটগুলো কী রংয়ের?"

"খেয়াল করি নি।"

আঁখি তখন ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল এবং আমি বুঝতে পারলাম আমি একটা জিনিস দেখেও সেটা লক্ষ্য করি না, আর বেচারি আঁখি সেটা কোনোদিন দেখতে পাবে না, আমার মুখ থেকে সেটা জেনেই সন্তুষ্ট হতে চায়। সেটাও আমি ঠিক করে করলাম না।

আমি তখন আঁখির এই নূতন ব্যাপারটা আবিষ্কার করলাম। শুধু শব্দ শুনে সে অনেক কিছু বুঝে ফেলে কিন্তু অনেক কিছু আছে যেগুলোর কোনো শব্দ নেই—আঁখি সেগুলোও জানতে চায়। নিজে থেকে সে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু যদি তাকে বলা হয় সে খুব আগ্রহ নিয়ে শোনে। আমি যখন তার পাশে বসেছিলাম তখন বাংলা স্যার ঢোকার পর সে আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আজকে কী রংয়ের কোট পরে এসেছেন?"

"সবুজ।"

"আজকেও সবুজ?"

"হ্যাঁ।"

"আহা বেচারা। একটা মাত্র কোট—তাও সবুজ রংয়ের।"

কিংবা যখন অঙ্ক ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকলেন তখন জিজ্ঞেস করল, "কী রংয়ের শাড়ি?"

আমি বললাম, "কী জানি। অনেক রকম রং আছে। ফুল টুল অনেক কিছু।"

"ব্লাউজটা কী রংয়ের?

"বেগুনি। নাকি নীল—"

"কপালে টিপ আছে?"

"নাই।"

আমারবই.কম amarboi.com

"চশমা?"

"আছে।"

মাঝে মাঝে আমি নিজে থেকে তাকে কিছু কিছু জিনিস বলে দিই—যেরকম সমাজবিজ্ঞান ক্লাসে আমাদের কিছু একটা লিখতে দিয়ে যখন স্যার টেবিলে পা তুলে বসে রইলেন আমি আঁখিকে ফিসফিস করে বললাম, "এই যে স্যার এখন নাকের লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করছেন। প্রথম চেষ্টা ফেইল। সেকেন্ড চেষ্টা—ওয়ান টু থ্রি পাস। লোমটা এখন খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছেন। মুখে হাসি।" শুনে আঁখিও হাসে।

যখন ক্লাসের ফাঁকে ছেলেপিলেরা নিজেদের মতো বসে থাকে তখন আমিও সেটা আঁখিকে শোনালাম, "বজলু ডান হাতের কেনে আঙুল কানের ভিতরে ঢুকিয়ে চুলকাচ্ছে একশ মাইল স্পিডে শাঁই শাঁই শাঁই—" কিংবা "মামুন একটা হাই তুলেছে, বিশাল হাই আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে" কিংবা, "শান্তা নিজের মনে মনে কথা বলছে, চোখ পাকালো আবার নরমাল আবার চোখ পাকালো—"

খুবই সাধারণ জিনিস কিন্তু আঁখি খুবই আগ্রহ নিয়ে শোনে! আঁখিকে বলতে গিয়ে আমিও আবিষ্কার করলাম আমাদের চারপাশে যা কিছু হতে থাকে সেগুলি খুবই সাধারণ কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার মাঝেই অসাধারণ ফাটাফাটি জিনিস লুকিয়ে আছে। যেমন ইংরেজি স্যারের ডান চোখটা যে মাঝে মাঝে চিড়িক চিড়িক করে নড়ে ওঠে সেটা আমি আগে কখনোই লক্ষ্য করি নি। আঁখি শোনার পর খুবই গম্ভীর হয়ে বলল, "এটার নাম টিক। নার্ভাস মানুষদের নাকি এগুলো হয়।" আমি একবারও ভাবি নি আমাদের এতো গুরুগম্ভীর ইংরেজি স্যার আসলে নার্ভাস।

আমরা যেরকম আঁখিকে দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আঁখিও মনে হয় এই নূতন স্কুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে স্কুলে আসে বেশ আগে, সাধারণত তার আব্বু নামিয়ে দিয়ে যান। ক্লাসে এসে টেবিলে বই রেখে প্রায় সময়ই সে বের হয়ে স্কুলের পিছন দিকে চলে যায়। সেখানে বড় বড় কয়েকটা গাছ আছে, সেই গাছগুলোতে পাখির কিচিরমিচির শোনা তার খুব প্রিয় একটা কাজ। ছোট ক্লাসের বাচ্চাগুলো সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে। তাদের গলার স্বর শুনে শুনে সে প্রায় সবগুলো বাচ্চাকে আলাদা করতে পারে—কারো নাম জানে না, কখনো দেখে নি শুধু গলার স্বর দিয়ে আলাদা আলাদা করে চেনা কাজটা মোটেও সোজা না—কিন্তু আঁখির কাছে সেটা কোনো ব্যাপারই না।

দুপুর বেলা আমরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতাম—আমাদের প্রিয় খেলা ছিল ক্রিকেট না হয় সাতচাড়া। স্কুলের লাইব্রেরিটা চালু হবার পর আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে লাইব্রেরিতে বই পড়তে যেতাম—যখন আবিষ্কার করেছি লাইব্রেরিটা প্রত্যেক দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত খোলা, আমরা যখন খুশি লাইব্রেরিতে যেতে পারি, যে কোনো বই নিতে পারি—সবচেয়ে বড় কথা হঠাৎ করে আবার লাইব্রেরিটা বন্ধ হয়ে যাবে না তখন আমরা আবার মাঠে ছোটাছুটি করে খেলতে শুরু করলাম। আমাদের এই দুইটা প্রিয় কাজ আঁখি করতে পারত না। লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ে হাত বুলানো ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। মাঠে ক্রিকেট কিংবা সাতচাড়া খেলার কোনো প্রশ্ন আসে না। আমরা যখন মাঠে ছোটাছুটি করে খেলি আঁখি তখন বারান্দায় পা দুলিয়ে বসে আমাদের খেলা উপভোগ করে। চোখে না দেখেও যে এতো মজা করে কেউ খেলা উপভোগ করতে পারে আঁখিকে না দেখলে আমরা সেটা বিশ্বাস করতাম না। আমাদের খুব ইচ্ছে করত আঁখিকে নিয়ে কোনো একটা কিছু খেলতে কিন্তু সে রকম কিছুই ভেবে বের করতে পারি নি। একমাত্র খেলা হতে পারে কানামাছি ভোঁ ভোঁ—সেই খেলায় কেউ নিশ্চয়ই আঁখিকে হারাতে পারবে না—কিন্তু আমরা সবাই তো বড় হয়ে গেছি এখন আমরা কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলি কেমন করে?

এর মাঝে একদিন নূতন ম্যাডাম আমাদের ক্লাস নিতে এলেন। আমাদের ভূগোল স্যারের বাবা মারা গেছেন, স্যার ভাই বাড়ি গেছেন। প্রথম দিন ক্লাসে কেউ এল না তাই আমরা মহা ফুর্তি করে কাটালাম। আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন হচ্ছে আশরাফ, সে খুবই ভালো একজন ক্লাস ক্যাপ্টেন, আমরা যখন ক্লাসে হইচই করি তখন সে শুধু চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ভয় দেখায়, "খবরদার গোলমাল করবি না, গোলমাল করলেই কিন্তু নাম লিখে স্যারদের দিয়ে দিব। পিটিয়ে তোদের বারোটা বাজিয়ে দেবে!" কিন্তু সে কখনোই আমাদের নাম লেখে না। মাঝে মাঝে সে ভান করে কারো একজনের নাম লিখে ফেলছে—আসলে শুধু হিজিবিজি লিখে রাখে। আমরা সবাই এতদিনে বুঝে গেছি আশরাফের মনটা খুবই নরম, সে কোনোদিন আমাদের কারো বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে না। তা ছাড়া আমরা জেনে গেছি আমাদের স্কুলে স্যার ম্যাডামরা আর আমাদের মারতে পারবে না। নালিশ করলে তারা বড়জোর বকাবকি করতে পারে—বকাবকিকে কে আর ভয় পায়? তাই আমাদের ক্লাসে

আমারবই.কম amarboi.com

যদি কোনো স্যার ম্যাডামের আসতে একটু দেরি হয় তা হলে ক্লাসের ভিতরে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যায়—বাইরে থেকে যে কেউ মনে করতে পারে ভিতরে বুঝি কাউকে মার্ডার করা হচ্ছে। প্রথম দিন যখন স্যার এলেন না তখন আমরা এতো গোলমাল করলাম যে আশেপাশের ক্লাস থেকে নিশ্চয়ই সবাই নালিশ করেছিল, তাই পরের দিন ক্লাস শুরু হতেই আমাদের নূতন ম্যাডাম এসে হাজির হলেন। তাকে দেখে আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। নূতন ম্যাডাম আমাদের চিৎকার করতে দিলেন, তারপরে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "ব্যাপারটা কী? তোমাদের চিৎকারের জন্যে আমাদের স্কুলটাকে না আবার নিষিদ্ধ করে দেয়।"

সুজন দাঁত বের করে হেসে বলল, "দোষটা তো আপনারই ম্যাডাম।"

ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন, "দোষ আমার?"

"জি ম্যাডাম। আপনি সবগুলি বেত পুড়িয়ে স্কুলে পিটাপিটি তুলে দিয়েছেন। এখন কেউ আর কোনোকিছুকে তয়ডর পায় না। সবাই খুবই আনন্দ করে, দুষ্টুমি করে, গোলমাল করে।"

ম্যাডাম বললেন, "তা হলে কি তুমি বলছ আমি বাজার থেকে বেত কিনে এনে আবার নূতন করে পিটাপিটি শুরু করে দেব?"

আমরা সবাই দুই হাত ছুড়ে মাথা নেড়ে চিৎকার করে বললাম, "না—না—না। কক্ষনো না।"

"তা হলে চুপ করে বস সবাই—কথা বলি তোমাদের সাথে।"

আমরা সবাই তখন সাথে সাথে চুপ করে বসলাম। ম্যাডাম পুরো ক্লাসের দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, "আমি কয়েকদিন থেকে ভাবছিলাম তোমাদের ক্লাসে একবার আসি—কিন্তু সবকিছু নিয়ে এত ব্যস্ত যে একেবারে সময় করতে পারি না।" ম্যাডাম কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "তোমাদের ক্লাসে কেন আমি আসতে চাচ্ছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, রিতু বলল, "জি ম্যাডাম। আপনি দেখতে চাচ্ছিলেন আমরা কি আঁখিকে জ্বালাচ্ছি নাকি আদর যত্ন করছি!"

"ঠিক বলেছ।" ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "আমি খুব বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তোমরা কেউ কিছু জান না তার মাঝে আমি আঁখিকে পাঠিয়ে দিলাম। যদি কিছু একটা গোলমাল হত—যদি আঁখি অ্যাডজাস্ট করতে না পারত, যদি মন খারাপ করত—"

আমরা সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করলাম, "ম্যাডাম গোলমাল হয়েছিল" "সর্বনাশ হয়েছিল" "বাংলা স্যার যা খারাপ খারাপ কথা বলছিলেন" "নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!" "ভয়ংকর অবস্থা" "পুরা বেইজ্জতি" "কী লজ্জা!"

ম্যাডাম হাত তুলে আমাদের থামালেন, বললেন, "আমি জানি। আমি সব খবর পেয়েছি। তোমরা ব্যাপারটা যেভাবে সামলে নিয়েছ তার কোনো তুলনা নেই।"

ম্যাডামের প্রশংসা শুনে আমরা সবাই আনন্দে দাঁত বের করে হাসলাম। ম্যাডাম বললেন, "কিন্তু যদি উল্টো ব্যাপারটা ঘটত? তোমাদের স্যার ঠিকভাবে নিতেন আর তোমরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে?"

আমরা প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম, "না, না ম্যাডাম, আমরা কখনোই নিষ্ঠুর হতাম না।"

ম্যাডাম বললেন, "ছোট বাচ্চারা না বুঝেই অনেক সময় নিষ্ঠুর হয়ে যায়। গরু কোরবানি দেখলে আমাদের বয়সী মানুষের ভয়ে হার্ট ফেল হয়ে যায়, দেখবে ছোট ছোট বাচ্চারা অবলীলায় গরু জবাই দেখছে।"

ম্যাডামের কথা শুনে আমরা অনেকেই মাথা নাড়লাম, আমাদের অনেকেই গরু জবাই দেখেছি, এটা দেখে যে বড় মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় আমরা জানতাম না। ম্যাডাম বললেন, "আমার একজন লেখক বন্ধু আছে তার খুব শখ বাচ্চাদের জন্যে বই লিখবে। সে তাই একটা বই লিখে বাচ্চাদের পড়তে দিয়েছে। পড়া শেষ হলে বাচ্চাদের কাছে জানতে চেয়েছে বইটা কেমন হয়েছে। বাচ্চারা কী বলেছে জান?"

"কী বলেছে?"

"বলেছে—এইটা আপনি কী লিখেছেন? পড়ে বমি এসে গেছে!"

আমরা সবাই হি হি করে হেসে উঠলাম। ম্যাডামও হাসলেন, একসময় হাসি থামিয়ে বললেন, "বাচ্চাদের কথা শুনে আমার সেই লেখক বন্ধু মনের দুঃখে লেখালেখিই ছেড়ে দিল।"

শান্তা বলল, "যে লেখা পড়লে বমি এসে যায় সেটা ছেড়ে দেওয়াই তো ভালো।"

ম্যাডাম মাথা নাড়লেন, "এগুলো খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। কোনো একটা লেখা পড়ে হয়তো একজনের বমি এসে যাচ্ছে আরেকজনের হয়তো সেই লেখাটাই খুব ভালো লাগবে। তবে সেটি কথা নয়, কথা হচ্ছে এভাবে সেটা

আমারবই.কম amarboi.com

সোজাসুজি বলে ফেলাটা। শুধুমাত্র একটা ছোট বাচ্চাই এরকম নিষ্ঠুরের মতো সত্য কথা বলতে পারে। বড়রা পারে না। বড়রা সব সময় ভদ্রতা করে মিষ্টি করে কথা বলে।"

এরকম সময়ে আঁখি হাত তুলল, ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "আঁখি, তুমি কিছু বলবে?"

"জি ম্যাডাম।"

"বল।"

"আপনারা সবাই আমাকে নিয়ে কথা বলছেন! তা হলে কি আমাকে একটু জিজ্ঞেস করবেন না আমি ভালো আছি না খারাপ আছি? হয়তো আমি খুবই খুবই খারাপ আছি, হয়তো এরা সবাই আমাকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালাতন করে, হয়তো আমার জান খারাপ করে দেয়, হয়তো আমার টিফিন চুরি করে খেয়ে ফেলে—"

ম্যাডাম একটু এগিয়ে এসে আঁখির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "খায় নাকি?"

"এখনো খায় নাই।"

"তা হলে?"

"সেজন্যেই তো রাগ করছি। আমার একেবারে খেতে ইচ্ছে করে না। কেউ চুরি করে খেলে কত ভালো হত—"

আমরা সবাই হি হি করে হাসলাম, সুজন বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে এখন থেকে চুরি করে খাব। কোনো চিন্তা নাই।"

বজলু বলল, "তোমার আম্মুকে বল ভালো ভালো নাস্তা বানিয়ে দিতে!"

ম্যাডাম বললেন, "এমনি তো সবকিছু ঠিক আছে আঁখি?"

"আছে ম্যাডাম।"

"নূতন স্কুলে ভালো লাগছে?"

"লেখাপড়া ছাড়া আর সবকিছু ভালো লাগছে।"

আমরা হি হি করে হাসলাম। ম্যাডাম বললেন, "তেরি গুড! আমি সেটাই চাই। লেখাপড়া ছাড়া আর সবকিছু ভালো লাগুক। পৃথিবীতে এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যার লেখাপড়া ভালো লাগে। যদি দেখা যায় কারো লেখাপড়া ভালো লাগছে তা হলে বুঝতে হবে তার মাথায় গোলমাল আছে।"

আমাদের মাঝে রাজু লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভালো, প্রতিবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। আমরা তার দিকে আঙুল দেখিয়ে আনন্দে চিৎকার করতে লাগলাম,

"মাথায় গোলমাল! মাথায় গোলমাল!" বেচারা রাজু লজ্জা পেয়ে লাল নীল বেগুনি হতে লাগল। মুখ গোঁজ করে বলল, "আমি কি কখনো বলেছি লেখাপড়া করতে ভালো লাগে? করতে হয় তাই করি।"

আমরা রাজুকে আরো জ্বালাতন করতাম কিন্তু ম্যাডাম আমাদের থামালেন, বললেন, "আমাদের লেখাপড়ার স্টাইলটা খুব খারাপ সেজন্যে তোমাদের এতো খারাপ লাগে। যখন আমরা স্টাইলটা ঠিক করব তখন দেখো এতো খারাপ লাগবে না!"

আমি ঠিক বুঝলাম না, লেখাপড়ার আবার স্টাইল কী। আর যদি থেকেও থাকে তা হলে সেটা আবার ঠিক করবে কেমন করে? আমি তাই হাত তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "ম্যাডাম! লেখাপড়ার স্টাইল ঠিক করে কেমন করে?"

"যেমন মনে কর এই ক্লাস রুমটা—বেঞ্চগুলো সারি সারি সাজানো—যারা সামনে বসেছে তারা আমাকে কাছে থেকে দেখছে কাছে থেকে কথা শুনছে। যারা পিছনে তারা দূর থেকে দেখছে দূর থেকে শুনছে। হয়তো সব সময় ভালো করে শুনছেও না। ক্লাসে স্যার ম্যাডামরা কথা বলে যায়—তোমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে হয়। কিন্তু ক্লাস রুমটা মোটেও এরকম হবার কথা না—"

"কীরকম হবার কথা ম্যাডাম?"

ম্যাডামের চোখেমুখে কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব ফুটে উঠল। হাত দিয়ে দরজাটা দেখিয়ে বললেন, "ঢুকতেই এখানে একটা এক্যুরিয়ামে থাকবে কিছু মাছ, ছোট ছোট কচ্ছপ। ওখানে একটা খরগোশের ফেমিলি। এখানে একটা কম্পিউটার।" দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে সারি সারি তাক, সেই তাক ভরা রাজ্যের বই। রংয়ের বাক্স। কাগজ কলম রং পেন্সিল। যন্ত্রপাতি স্ক্রু ড্রাইভার সায়েন্স কিট। ক্লাসের দেওয়ালে চারিদিকে ব্ল্যাকবোর্ড। তোমরা বসবে ছোট ছোট গ্রুপে—একটা টেবিলের চারপাশে।" ম্যাডাম হাত দিয়ে দেখালেন, "এখানে কয়েকজন, ওখানে কয়েকজন। মেঝেতে কোথাও হয়তো কার্পেট, কেউ কেউ হয়তো সেখানেই বসবে। আর আমরা যারা পড়াব তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না পড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াব, কখনো এখানে কখনো ওখানে। আমি হয়তো কিছুক্ষণ পড়ালাম তারপর তোমরা কথা বললে। নিজেরা নিজেরা আলোচনা করলে। পড়তে পড়তে হয়তো উঠে গেলে ওখানে টবে হয়তো গাছ লাগিয়েছ সেগুলোতে পানি দিলে। জানালার ওখানে হয়তো পাখি কিচিরমিচির করছে তাদের কিছু খেতে দিলে!" ম্যাডাম একটা নিঃশ্বাস ফেলে থামলেন, তার

আমারবই.কম amarboi.com

মুখটাতে কেমন যেন দুঃখ দুঃখ ভাব চলে এল। আমাদের এরকম একটা ক্লাস রুম দিতে পারছেন না মনে হল সেজন্যে তার মন খারাপ হয়ে গেছে।

আমি হাত তুলে বললাম, "ম্যাডাম।"

"বল।"

"আপনি যেগুলি বলেছেন তার কোনোটাই আমাদের নাই কিন্তু একটা আছে।"

"কোনটা আছে?"

"পাখি। আমাদের এখানে পাখি আসে, আর আঁখি সব সময় তাদের খেতে দেয়।"

"সত্যি?"

আঁখি একটু হেসে বলল, "জি ম্যাডাম।"

"কী পাখি জান?"

"আগে একটা ফিঙে আসত তার দুইটা বাচ্চা নিয়ে। এখন কয়েকটা চড়াই পাখিও আসে। দুপুরের দিকে তিনটা শালিক পাখি আসে!

"বাহ!" ম্যাডাম খুশি হয়ে বললেন, "কী সুইট!"

রিতু বলল, "আস্তে আস্তে অন্যগুলোও হয়ে যাবে ম্যাডাম। আপনি দেখবেন—"

"নিশ্চয়ই হবে। ক্লাস রুমটা অন্যরকম হতে একটু সময় লাগলে ক্ষতি নেই কিন্তু আমাদের—আই মিন শিক্ষকদের সবার আগে অন্যরকম হতে হবে! সেটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ লাভ নেই।"

আমাদের ভূগোল পড়ানোর কথা ছিল কিন্তু ম্যাডাম পুরো ক্লাস গল্প করে কাটিয়ে দিলেন। নানারকম গল্প—কোনো কোনোটা শুনে আমরা হেসে কুটি কুটি হলাম, কোনো কোনোটা শুনে আমাদের চোখ ছলছল করে উঠল, কোনো কোনোটা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম আবার কোনো কোনোটা শুনে রাগে আমাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল।

যখন ক্লাসের ঘণ্টা বাজল তখন আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল। ম্যাডাম চক ডাস্টার নিয়ে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন আমরা তখন বললাম, "ম্যাডাম, আপনি এখন থেকে আমাদের এই ক্লাসটা নেন। প্লিজ ম্যাডাম!"

ম্যাডাম বললেন, "এটাই নিতে পারব কি না জানি না কিন্তু কোনো একটা ক্লাস নেব। নিশ্চয়ই নেব।"

সুজন বলল, "যদি না নেন তা হলে কী হবে বুঝতে পারছেন?"

"না বুঝতে পারছি না। কী হবে?"

"আমরা সবাই দোয়া করতে থাকব যেন—"

"যেন কী?"

"যেন আমাদের অন্য সব স্যার ম্যাডামদের বাবা মারা যেতে থাকেন!"

ম্যাডাম চোখ পাকিয়ে বললেন, "দুষ্টু ছেলে!"

আমরা সবাই হি হি করে হাসতে লাগলাম। ম্যাডাম ক্লাস থেকে বের হতে হতে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা খুব একটা স্পেশাল ক্লাস—তার কারণ এখানে স্পেশাল একজন ছাত্রী আছে। তোমরা সবাই মিলে তাকে দেখেশুনে রাখবে কিন্তু।"

আমরা সবাই একসাথে চিৎকার করে বললাম, "রাখব ম্যাডাম!"

এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে ঠিক করে দেখেশুনে রাখা নিয়ে যা একটা ব্যাপার ঘটল সেটা বলার মতো নয়!

আমারবই.কম amarboi.com

৫

যখন আঁখিকে দেখেশুনে রাখার কথা অথচ উল্টো তাকে নিয়ে একটা মহাবিপদের মাঝে পড়ে গেলাম

অঙ্ক ক্লাসে সুমি একটা হাঁচি দিল, হাঁচি এমন কিছু অবাক ঘটনা না—যে কেউ হাঁচি দিতে পারে। সুমির হাঁচি কিন্তু একটা অবাক ঘটনা হয়ে গেল। কারণ একটু পর সে আরেকটা হাঁচি দিল, তারপর আরেকটা তারপর আরেকটা তারপর দিতেই লাগল।

অঙ্ক স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোর হয়েছেটা কী?"

সুমি একটা হাঁচি দিয়ে বলল, "এলার্জি।"

"কিসের এলার্জি?"

সুজন ফিসফিস করে বলল, "জ্যামিতি ক্লাসের।" কেউ সেই কথাটা শুনতে পেল না, সুমি বলল, "জানি না স্যার। আমার মাঝে মাঝে হয়।" কথা শেষ করে সুমি আরেকটা হাঁচি দিল।

অঙ্ক স্যার বললেন, "যা বাথরুম থেকে নাক ধুয়ে আয়।"

সুমি মিনমিন করে বলল, "লাভ হবে না স্যার।" তারপর আরেকটা হাঁচি দিল।

স্যার বললেন, "যা বলছি।"

কাজেই সুমি বাথরুমে নাক ধুতে গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরেও এল, নাক চোখ মুখ পানি দিয়ে ধুয়ে এসেছে কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। একটু পর পর হাঁচি দিচ্ছে, নাকটা টমেটোর মতো লাল। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁচি কমে নাই?"

সুমি মাথা নাড়ল, "না স্যার।" তারপর একটা হাঁচি দিল।

"কী করবি তা হলে?"

"এলার্জির একটা ট্যাবলেট আছে সেটা খেলে কমে যাবে।"

"কোথায় সেই ট্যাবলেট?"

"ব্যাগের মাঝে থাকে। এখন আছে কি না জানি না।" আবার হাঁচি। "তা হলে দেখ আছে কি না। থাকলে বের করে খা।" সুমি তার ব্যাগ আতিপাতি করে খুঁজল, ব্যাগের মাঝে নাই। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "ট্যাবলেটের নাম জানিস?"

"জানি স্যার।"

তা হলে টিফিনের ছুটিতে কাউকে পাঠিয়ে কিনে আনিস।

সুজন তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "আমি কিনে আনব স্যার।"

স্যার সুজনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "একা যাবি না। সাথে আরো দুই একজনকে নিয়ে যাস।"

সুজন মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

ঠিক তখন টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। অঙ্ক স্যার বের হবার পর সুজন জিজ্ঞেস করল, "আমার সাথে কে যাবি ওষুধ কিনতে?"

আমি বললাম, "আমি।"

"আয় তা হলে।"

সুমির কাছ থেকে ওষুধের নামটা লিখে নিয়ে আমরা ক্লাস থেকে বের হলাম। যখন হেঁটে হেঁটে স্কুলের গেটের কাছে এসেছি তখন শুনলাম কে যেন পিছন থেকে ডাকছে, "এই সুজন, রিতু দাঁড়া।"

তাকিয়ে দেখি রিতু আর আঁখি। রিতু হাঁটছে তার থেকে একটু পিছনে আঁখি, রিতুর কনুইটা আস্তে করে ধরে রেখেছে, দেখে বোঝাই যায় না যে ধরে রেখেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কী হল?"

"আমরাও যাব।"

"কোথায় যাবি?"

"ওষুধ কিনতে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ওষুধ কিনতে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

রিতু চোখ মটকে বলল, "এমনি একটু বাইরে থেকে হেঁটে আসি।"

আমারবই.কম amarboi.com

"আঁখিকে নিয়ে?"

"আঁখির জন্যেই তো যাচ্ছি! বাইরে থেকে হেঁটে আসি।"

"স্যার যদি জানেন?"

"স্যার জানলে সমস্যা কী? স্যারই তো সুজনকে বলেছেন কয়েকজনকে নিয়ে যেতে। আমরা হচ্ছি কয়েকজন।"

সুজন দাঁত বের করে হাসল, বলল, "চল!" যে কোনো বেআইনি কাজে সুজনের সব সময় উৎসাহ।

আমরা যখন গেটের কাছে পৌঁছে গেছি তখন মামুন আমাদের কাছে ছুটে এলো, জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাস?"

রিতু বলল, "সুমির ওষুধ কিনতে।"

"এতো জন?"

"সমস্যা কী? এই তো রাস্তার ওপাশে ফার্মেসি। যাব আর আসব।"

"আমিও যাব।"

সুজন মুখ ভেংচে বলল, "তুই একা কেন? আরো চৌদ্দজনকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়! তারপর সবাই মিলে মিছিল করতে করতে যাই!"

রিতু বলল, "আমি স্লোগান দিয়ে বলব, যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি কোথায়। সবাই বলবে সুমির ওষুধ কিনতে! সুমির ওষুধ কিনতে!"

মামুন মুখ শক্ত করে বলল, "আমি সাথে গেলে তোদের সমস্যা আছে?"

আমি বললাম, "নাই।"

"তা হলে চল।"

কাজেই আমরা পাঁচজন গেটে হাজির হলাম। দারোয়ান ভুরু কুঁচকে বলল, "কী চাও?"

রিতু বলল, "বাইরে যাব।"

"বাইরে যাবে? কেন?"

"আমাদের এক ফ্রেন্ডের জন্যে ওষুধ কিনতে। খুব সিরিয়াস অবস্থা।"

"কী হয়েছে?"

"এলার্জি।"

"সেটা কী?"

সুজন বলল, "খুব ভয়ংকর অসুখ। সারা শরীরে চাকা চাকা লাল দাগ। চোখমুখ ফুলে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।"

এই হচ্ছে সুজনের কথা বলার ধরন। যেখানে সত্যি কথা বললেই কাজ হয় সেখানেও মিথ্যা কথা বলে ফেলে। দারোয়ান সুজনের কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হয় না, মুখ শক্ত করে বলল, "টিফিনের ছুটিতে কোনো ছেলেমেয়ের বের হবার পারমিশান নাই।"

সুজন চোখ লাল করে বলল, "আপনি চান আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাক?"

মারা যাবার কথা শুনেও দারোয়ানের কোনো ভাবান্তর হল না। সে একটা হাই তুলে ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল, "সেইটার দায়িত্ব আমার না। আমার দায়িত্ব গেট খোলা আর গেট বন্ধ করা।"

সুজন গরম হয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে জালাল স্যারকে জিজ্ঞেস করেন।"

আমাদের অঙ্ক স্যারের নাম জালালউদ্দিন, স্কুলে এই স্যারকে সবাই গুরুত্ব দেয়। দারোয়ানও গুরুত্ব দিল, পকেট থেকে তার মোবাইল টেলিফোন বের করে সে কোনো একটা নম্বর ডায়াল করল, অন্য পাশে ফোন ধরার পর বলল, "স্যার কিছু ছেলেমেয়ে বলছে তাদের নাকি ওষুধ কিনার জন্যে বাইরে যাওয়া দরকার—"

দারোয়ানের কথা শেষ হবার আগেই স্যার নিশ্চয়ই সেটা সত্যি বলে জানিয়েছেন। কাজেই দারোয়ান খুবই বিরস মুখে টেলিফোনটা পকেটে রাখল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গেটের ছিটকানি খুলে আমাদের বের হতে দিল। সুজন মুখ শক্ত করে বলল, "আপনার জন্য আমাদের দেরি হল। যদি সুমির কিছু হয় তা হলে কিন্তু আপনি দায়ী থাকবেন।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি হয়ে গেলে চোখেমুখে যেরকম গম্ভীর ভাব রাখতে হয় আমরা সেরকম গম্ভীর ভাব করে গেট দিয়ে বের হলাম। বের হবার পরই অবিশ্যি আমাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমরা রাস্তাটা পার হয়ে ফার্মেসিতে ঢুকলাম। ফার্মেসির মানুষটা একটা খবরের কাগজ পড়ছে, আমাদের দেখে চোখ তুলে তাকাল। সুমির ওষুধটার নাম কাগজে লিখে এনেছিলাম সেটা মানুষটার হাতে দিয়ে বললাম, "এইটা আছে?"

মানুষটা দেখে বলল, "আছে। কয়টা নিবে?"

সুজন জিজ্ঞেস করল, "দাম কত?"

"এক পাতা দুই টাকা।"

আমারবই.কম amarboi.com

এক পাতায় অনেকগুলো ট্যাবলেট থাকে, এতোগুলো ট্যাবলেটের দাম মাত্র দুই টাকা। আমি পকেট থেকে টাকা বের করছিলাম কিন্তু সুজনের কথা শুনে থেমে গেলাম। সে দরদাম শুরু করে দিল, "কম করে বলেন। এক টাকা।"

মানুষটা সুজনের কথা শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, "এক টাকা?"

"হ্যাঁ। এক টাকা।"

মানুষটা খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে আলমারি খুলে একটা ওষুধের বাক্স থেকে এক পাতা ট্যাবলেট বের করে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমাদের দিকে ছুড়ে দিল। আমি পকেট থেকে টাকা বের করলাম, লোকটা বলল, "টাকা দিতে হবে না। যাও। এক পাতা ওষুধের জন্যে যে দুই টাকা দিতে পারে না তার কাছ থেকে আমার টাকা নিতে হবে না। তোমার দুই টাকার জন্যে আমার লাল বাতি জ্বলবে না।"

আমার অসম্ভব অপমান হল, কিন্তু সুজনের কোনোই ভাবান্তর হল না। সে ট্যাবলেটের পাতাটা নিয়ে আমাদেরকে বলল, "চল।"

আমরা ফার্মেসি থেকে বের হয়ে এলাম, রিতু বলল, "কী লজ্জা। কী লজ্জা।"

সুজন বলল, "লজ্জার কী আছে?"

আমি রেগে বললাম, "লজ্জার কী আছে তুই বুঝিস নি। গাধা কোথাকার? আমরা কি ফকির নাকি যে ভিক্ষে নেবে।"

মামুন বলল, "ওষুধের ডেট নিশ্চয়ই শেষ, ফেলে না দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে।"

আমরা তখন ট্যাবলেটের পাতাটা ওলটপালট করে দেখার চেষ্টা করলাম কোথাও তারিখ দেওয়া আছে কি না। তারিখ দেওয়া নেই তাই বোঝা গেল না বাতিল হয়ে যাওয়া ওষুধ আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে কি না। আঁখি বলল, "বাতিল ওষুধ না। ওষুধ ঠিকই আছে।"

রিতু বলল, "তুই কেমন করে জানিস?" প্রথম প্রথম কয়েকদিন ভদ্রতা করে আঁখির সাথে সবাই তুমি করে কথা বলেছে এখন আমরা তুইয়ে নেমে এসেছি।

আঁখি বলল, "না জানার কী আছে? দুই টাকার ওষুধ ফ্রি দেওয়ার জন্যে বাতিল ওষুধ খুঁজতে হয় না।"

আমি বললাম, "চল তা হলে যাই।"

সুজনকে স্কুলে ফিরে যাবার ব্যাপারে খুব উৎসাহী দেখা গেল না। সে বলল, "আয় আরেকটা ফার্মেসি দেখে যাই।"

ওষুধটা যেহেতু হয়েই গেছে এখন স্কুলে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই আমরা সবাই সুজনের কথায় রাজি হয়ে গেলাম। পাঁচজন মিলে কথা বলতে বলতে হাসাহাসি করতে করতে হাঁটতে থাকি। পরের ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সুজন বলল, "নাহ্। এখান থেকে ওষুধ কেনা যাবে না।"

রিতু জানতে চাইল, "কেন?"

"যে মানুষটা ওষুধ বিক্রি করছে তার চেহারাটা ভালো না।"

একজন মানুষের চেহারা ভালো না হলে তার থেকে ওষুধ কেনা যাবে না এরকম যুক্তি এর আগে কেউ কখনো দিয়েছে বলে মনে হয় না কিন্তু আমরা যুক্তিটা মেনে নিলাম। এর পরে বড় একটা জেনারেল স্টোর ধরনের দোকান পাওয়া গেল যেটা দেখে সুজনের খিদে পেয়ে গেল। আমরা তখন টাকাপয়সা ভাগাভাগি করে দুইটা চিপসের প্যাকেট কিনলাম—এখানেও সুজন খারাপ ভাবে দরদাম করল। এবারে অবশ্যি কোনো লাভ হল না, মানুষটা রেগেমেগে আমাদের ফ্রি দিয়ে দিল না। আমরা চিপস খেতে খেতে হাঁটতে থাকি তখন আরেকটা ফার্মেসি পেলাম, সেটা রাস্তার অন্যপাশে কাজেই সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তখন মামুন বলল আমরা যদি এক কিলোমিটার হাঁটতে রাজি থাকি তা হলে শহরের সবচেয়ে বড় ফার্মেসি থেকে ওষুধটা কিনতে পারব। আমরা রাজি হয়ে হাঁটতে লাগলাম তখন মামুন রিকশা করে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। আমরা তখন আবার টাকাপয়সা ভাগাভাগি করে দেখলাম যে ইচ্ছে করলে রিকশা করে যেতে পারি।

আমরা তখন দরদাম করে দুইটা রিকশা ভাড়া করলাম, একটা রিকশায় উঠল রিতু আর আঁখি অন্যটাতে আমি মামুন আর সুজন। আমরা গল্প করতে করতে যাচ্ছি, ফাঁকা রাস্তায় রিকশা গুলির মতন ছুটছে। হঠাৎ করে সামনের রিকশাটি থেমে গেল আর সেখান থেকে রিতু আমাদের চিৎকার করে ডাকল। আমরা আমাদের রিকশা থেকে নেমে রিতুর কাছে গেলাম। রিতু বলল, "আঁখি বলছে অবস্থা ভালো না।"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কার অবস্থা ভালো না?"

আঁখি বলল, "এই এলাকার।"

আমারবই.কম amarboi.com

"কী হয়েছে এই এলাকায়?"

"কোনো একটা গোলমাল হয়েছে এখানে।"

"গোলমাল?" আমরা অবাক হয়ে চারিদিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আঁখি সত্যি কথা বলছে। এটা মোটামুটি বড় রাস্তা অনেক গাড়ি যাবার কথা কিন্তু এখন কোথাও কিছু নেই। দোকানপাট বন্ধ এবং মানুষজন এদিকে সেদিকে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং চিন্তিত মুখে কথা বলছে। দূরে অনেকগুলো পুলিশ।

আমি বললাম, "চল ফিরে যাই।"

সুজন বলল, "আগে দেখি কী হয়েছে।"

আমরা কিছু বলার আগে হঠাৎ করে কোথা থেকে অনেকগুলো মানুষ হইচই করতে করতে ছুটে আসতে থাকে, তাদের হাতে লাঠিসোঁটা। "একশান একশান ডাইরেক্ট একশান" বলতে বলতে তারা ঢিল ছুড়তে ছুড়তে একদিক থেকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং অন্যদিক থেকে পুলিশ তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে। পুলিশ আর এই মানুষগুলো দেখতে দেখতে একদল আরেকদলের ওপর চড়াও হল এবং প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমরা ঠিক মাঝখানে—রিতু আর আঁখি রিকশা থেকে নেমে পড়ে আর আমরা প্রাণপণে ছুটতে থাকি। ছুটতে ছুটতে আঁখি রাস্তায় আছড়ে পড়ল, মানুষজন তার ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে পুলিশ লাঠি দিয়ে লোকজনকে পেটাতে থাকে। আমি কোনোমতে আঁখির কাছে ছুটে গেলাম, তাকে টেনে দাঁড়া করিয়ে অন্যদের খুঁজতে লাগলাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। আঁখির চোখেমুখে আতঙ্ক, সে আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। আমার মনে হল দূরে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মানুষ আর্তনাদ করতে লাগল এবং তার মাঝে কয়েকটা বিস্ফোরণ হল। ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকেরা ছোটাছুটি করছে এবং ছবি তুলছে। আমি আঁখিকে ধরে দৌড়াতে লাগলাম এবং মনে হল তখন সাংবাদিকেরা আমাদের ছবি তুলতে শুরু করেছে।

একটা দোকানের বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অন্যদের খুঁজলাম, আশেপাশে কেউ নেই কে কোন দিকে গিয়েছে জানি না। রাস্তায় একজন মানুষ পড়ে আছে, মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। অন্য একজন মানুষ ভয়ে পুলিশের দিকে তাকাচ্ছে। পুলিশ তাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পিটাতে থাকে।

হঠাৎ করে চারপাশে একটু ফাঁকা হয়ে যায় এবং শিলাবৃষ্টির মতো ঢিল পড়তে থাকে। ঠিক আমার কানের কাছে দিয়ে বড় একটা ঢিল উড়ে গিয়ে

নিচে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আমি আতঙ্কিত হয়ে তাকালাম—দূর থেকে অনেক মানুষ ঢিল ছুড়ছে, এর যে কোনো একটা ঢিল মাথায় লাগলে মাথা ফেটে ঘিলু বের হয়ে যাবে। আমি দূর থেকে উড়ে আসা ঢিলগুলি দেখতে পাই, একটু সরে যেতে পারি কিন্তু আঁখি তো পারবে না—সে তো কিছু দেখছে না।

"আঁখি!"

"কী?"

"তুই আমাকে ধরে থাকিস—আমি যেদিকে সরি তুই সেদিকে সরে যাবি।"

আঁখি কাঁপা গলায় বলল, "ঠিক আছে।"

ঠিক তখন একটা গাড়ি সাইরেন বাজাতে বাজাতে গেল, আর দূরের মানুষগুলো আরো দূরে সরে গেল। ঢিল একটু কমে এল আর আমি রিতুকে দেখতে পেলাম, সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আমাদের কাছে ছুটে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি।"

আঁখি জিজ্ঞেস করল, "বেশি?"

"না। ঠিক হয়ে যাবে।"

আমরা তখন আমাদের বাকি দুজনকে দেখতে পেলাম, তারাও দৌড়ে আমার কাছে এল, সুজনের চোখে একটা ঝলঝলে সানগ্লাস। আমাদের দেখিয়ে বলল, "দেখেছিস? রাস্তায় পেয়েছি, ফাটাফাটি সানগ্লাস।"

আমার বিশ্বাস হল না এরকম সময়ে কেউ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে একটা সানগ্লাস তুলে নিতে পারে। সানগ্লাসটা ফাটাফাটি হতে পারে কিন্তু সেটা পরার পর সুজনকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত! আমাদের রাস্তার মোড়ে একজন অন্ধ ফকির ভিক্ষে করে, বসন্ত হয়ে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, সে এরকম একটা সানগ্লাস পরে থাকে। সুজনকে আমি সেটা এখন আর বললাম না, সেটা বলার সময়ও এটা না, এখন আমাদের কোটি টাকার প্রশ্ন আমরা কেমন করে স্কুলে ফিরে যাব। এরকম ভয়ংকর মারামারির মাঝে হাজির হওয়ার খবরটা বাসায় কিংবা স্কুলে পৌঁছে গেলে আমাদের কপালে দুঃখ আছে। সাংবাদিকেরা আমাদের ছবি তুলছিল, যদি সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়ে যায় তা হলে কী হবে? আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম, এরকম একটা জায়গায় আমরা আঁখিকে টেনে নিয়ে এসেছি সেটা যখন স্যার ম্যাডাম জানতে পারবেন তখন কী হবে? মাত্র এক সপ্তাহ আগে নূতন

আমারবই.কম amarboi.com

ম্যাডাম বলেছেন আমরা যেন আঁখিকে ভালো করে দেখেশুনে রাখি—এটা কি দেখেশুনে রাখার নমুনা? যদি একটা ঢিল এসে আঁখির গায়ে লাগত তা হলে কী হত?

সুজন বলল, "রাস্তায় একটা মানিব্যাগ পড়ে ছিল, তোলার আগেই আরেকজন তুলে নিল। ইস!"

রিতু চোখ পাকিয়ে বলল, "তোর মানিব্যাগের খেতাপুড়ি। এখন ফিরে যাব কেমন করে?"

মামুন বলল, "হেঁটে। আবার কীভাবে?"

আমি দূরে মানুষের জটলার দিকে তাকিয়ে বললাম, "মারামারি কি বন্ধ হয়েছে?"

আঁখি বলল, "হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে।"

আমরা চোখ দিয়ে দেখে যেটা বুঝতে পারি না আঁখি কান দিয়ে শুনে সেটা বুঝে ফেলে। আমি বললাম, "চল তা হলে যাই।"

ঠিক যখন রওনা দিব তখন একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল, অনেকগুলো পুলিশ সেখান থেকে নেমে আমাদের দিকে ছুটে আসে। সবার সামনে পাহাড়ের মতো বড় একজন পুলিশ, হাত পা নেড়ে চিৎকার করে বলল, "এই! এই পোলাপান। তোমরা এইখানে কী কর?"

আমরা কিছু বলার আগেই আরেকজন বলল, "কথা বলার দরকার নাই। লাঠি দিয়া দুইটা বাড়ি দেন।"

একজন সত্যি সত্যি মোটা একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে এল, তখন আরেকজন থামিয়ে বলল, "দাঁড়াও। এরা কী করে এইখানে? আমরা যেখানে থাকার সাহস পাই না সেখানে এরা কী করে?"

একজন সুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটাই হচ্ছে পালের গোদা। বদমাইশ। আমি দেখেছি এইটা ঢিল ছুড়ছে।"

সুজন মিনমিন করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন পাহাড়ের মতো পুলিশটা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর বদমাইশ। মাথা ভেঙে ফেলব।"

রিতু এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে সে একটু চেষ্টা করল কিন্তু পাহাড়ের মতো লোকটা ধমক দিয়ে তাকেও থামিয়ে দিয়ে বলল, "সবগুলোর কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাই। একরাত হাজতে থাকুক তারপর চালান দিয়ে দিব। তখন বুঝবে মজা।"

আরেকজন বলল, "বাপ মায়েরও একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। ছেলেপিলেরে মানুষ করতে পারে না, একেকটা বড় হচ্ছে যেন ইবলিসের বাচ্চা হয়ে।"

রিতু আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করল, মানুষটা চিৎকার করে বলল, "খবরদার একটা কথা না। গাড়িতে উঠ।"

আমরা কিছু বলার সুযোগ পেলাম না, পুলিশগুলো ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে পুলিশ ভ্যানের পিছনে তুলে নিল। বেচারি আঁখি কোথায় কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তখন পাহাড়ের মতো মানুষটা খেঁকিয়ে উঠল, "কানা নাকি? চোখে দেখতে পাও না?"

আঁখি কিছু বলল না।

ভ্যানের পিছনে তোলার পর দুইজন আমাদের পাশে বসল। তখন গাড়িটা ছেড়ে দিল। আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। বলেছে হাজতে নিয়ে রাখবে, তারপরে নাকি চালান দিবে? কেমন করে চালান দেয়? কোথায় চালান দেয়? যখন সবাই খবর পাবে যে পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে তখন তারা কী করবে? আব্বু আম্মু কী করবেন? নূতন ম্যাডাম কী করবেন? আমাদের নিশ্চয়ই টি সি দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিবে। তখন আমি কী করব? অন্যেরা কী করবে?

চিন্তা করে যখন কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না তখন শুনলাম সুজন ফিসফিস করে বলছে, "পালাতে হবে।"

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "পালাতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

"যখন গাড়িটা থামবে, তখন লাফিয়ে নামব। তারপর দৌড়।"

"আঁখি? আঁখি কী করবে?"

"আঁখিও দৌড়াবে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেমন করে?"

"একজনকে ধরে।" আমি বুঝতে পারলাম না সেটা কেমন করে সম্ভব। কিন্তু দেখা গেল সুজন ফিসফিস করে সবাইকে এই কথাই বলে দিচ্ছে। আঁখিকেও বলা হল এবং আমি দেখলাম সেটা শুনে সে কেমন যেন চমকে উঠল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল কিন্তু সে আপত্তি করল না। আমরা ফিসফিস করে কথা বলছি সেটা হঠাৎ করে পাহাড়ের মতো পুলিশটা লক্ষ্য করল, সাথে সাথে

আমারবই.কম amarboi.com

সে খেঁকিয়ে ওঠে, "কী হচ্ছে এইখানে? গুজগুজ ফুসফুস কীসের? এক বাড়ি দিয়ে মুখ ভেঙে ফেলব।"

কাজেই আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। গাড়ি করে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তখনো বুঝতে পারছি না হঠাৎ সেটা থেমে গেল। তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার পাশে কয়েকজন পুলিশ অফিসার, একজন হাত তুলে গাড়িটা থামিয়েছেন। এখন আমাদের লাফ দিয়ে নামতে হবে তারপর দৌড় দিতে হবে। আঁখির হাতে ভাঁজ করা লাঠিটা সে ছেড়ে দিল, সাথে সাথে সেটা লম্বা হয়ে যায়, সেটা হাতে নিয়ে সে শক্ত হয়ে বসে থাকে। পুলিশ অফিসারটি গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকালেন। পাহাড়ের মতো পুলিশটি নেমে অফিসারকে একটা সেল্যুট দিল। অন্যজনও হাচড়পাচড় করে নেমে পড়ে। পুলিশ অফিসারটি আমাদের দিকে তাকালেন, তারপর একটু অবাক হয়ে পাহাড়ের মতো পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা?"

পাহাড়ের মতো পুলিশটা বলল, "স্পটে ধরা পড়েছে। ঢিল ছুড়ছিল।"

অফিসারটা আঁখির দিকে তাকালেন, তার হাতের সাদা লাঠিটার দিকে তাকালেন। তারপর সুজনের দিকে তাকালেন তারপর তার অন্ধ ফকিরের মতো সানগ্লাসের দিকে তাকালেন তারপর আমাদের দিকে তাকালেন, তারপর পাহাড়ের মতো পুলিশটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি জান এরা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বাচ্চা?"

পাহাড়ের মতো পুলিশটা বলল, "জে?"

"ঐ মেয়েটার হাতে সাদা লাঠিটা দেখেছ? দ্য হোয়াইট কেইন? তুমি কি জান পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশে ঐ সাদা লাঠিটা দেখামাত্র পুরো সিস্টেম তাকে সাহায্য করার জন্যে এলার্ট হয়ে যায়? তার যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্যে সবাই এগিয়ে আসে। আর এই আনফর্চুনেট দেশে তুমি তাদেরকে মিসক্রিয়েন্ট বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছ?" পুলিশ অফিসারটি ধমক দিয়ে বললেন, "আর ইউ ক্রেজি? আর ইউ স্টুপিড?"

পাহাড়ের মতো মানুষটা একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, দুর্বলভাবে বলল, "আমি দেখলাম ঢিল ছুড়ছে—"

পুলিশ অফিসারটা বললেন, "ডোন্ট টক ননসেন্স। এই মুহূর্তে ওদেরকে ওদের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আস।"

"জি স্যার।"

আঁখি বলল, "থ্যাংকু। আপনাকে অনেক থ্যাংকু।"

পুলিশ অফিসারটি বললেন, "তুমি কিছু মনে কোরো না মা।"

আবার গাড়ি ছেড়ে দিল, এবারে অবস্থা পুরোপুরি অন্যরকম। পাহাড়ের মতো মানুষটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তোমরা সবাই অন্ধ?"

মামুন বলল, "হ্যাঁ।"

আমি সুজনকে দেখিয়ে বললাম, "অন্ধ না হলে কি কেউ এইরকম কালো চশমা পরে?"

"কিন্তু, দেখে বোঝা যায় না।"

সুজন বলল, "আমরা যেহেতু চোখে দেখি না তাই বেশিরভাগ কাজকর্ম করি কানে শুনে। আমাদের কান খুব ভালো। সবকিছু আমরা শুনি। শুনে বুঝে ফেলি।"

রিতু বলল, "যেমন আপনার নিঃশ্বাসের শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। সেই শব্দ শুনে বুঝতে পারছি আপনার সাইজ পাহাড়ের মতো।"

"তাজ্জব ব্যাপার।"

মামুন বলল, "আপনার চেহারাটাও ভালো না।"

পাহাড়ের মতো মানুষটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "সেইটা তুমি কেমন করে বললে?"

মামুন উত্তর দেবার আগেই আঁখি বলল, "যে মানুষ যত সুন্দর করে কথা বলে তার চেহারা আমাদের কাছে তত সুন্দর মনে হয়। আপনি তো আমাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলেন নাই।"

পাহাড়ের মতো মানুষটাকে কেমন জানি বিপর্যস্ত দেখাল। আমাদের স্কুলের গেট আসার আগে পর্যন্ত সেই মানুষটা আর একটা কথাও বলল না।

আমারবই.কম amarboi.com

৬

যখন আমি বড় বড় গোঁফের একজন মুচির সাহায্যে ঝুনঝুন বল আবিষ্কার করলাম

ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছি তখন ভাইয়া জিজ্ঞেস করল, "তোদের ক্লাসের কানা মেয়েটার কী খবর?"

আমি প্রশ্নটা না শোনার ভান করে খেতে থাকলাম। ভাইয়া আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হল? কথার উত্তর দিস না কেন?"

"কোন কথা?"

"কানা মেয়েটার কথা?"

"আমি কোনো কানা মেয়েকে চিনি না।"

"আমার সাথে ঢং করিস, তাই না?"

"আমি মোটেও ঢং করছি না।"

"তা হলে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

"তুমি সুন্দর করে প্রশ্ন কর আমি উত্তর দেব।"

ভাইয়া কেমন যেন খেপে উঠল, আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু দেখেছ, তিতা কেমন বেয়াদপ হয়ে উঠছে?"

আম্মু কিছু বলার আগেই আমি বললাম "আমার নাম তিতা না। আমার নাম তিতু।"

ফুলি খালা ডাল নিয়ে আসছিলেন, টেবিলে রেখে ভাইয়াকে বললেন, "মানুষের নাম নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা ঠিক না। তিতু যখন পছন্দ করে না তখন তুমি কেন তারে তিতা ডাক?"

ভাইয়া ফুলি খালার ধমক খেয়ে কেমন যেন চিমসে গেল। আব্বু বললেন, "ফুলি ঠিকই বলেছে টিটু। তুমি তিতুকে কেন তিতা ডাক?"

আম্মু বললেন, "আর কখনো ডাকবে না।"

ভাইয়া তখন মুখটা গোঁজ করে খেতে লাগল। তখন আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের ক্লাসের ঐ মেয়েটা কেমন আছে?"

"আঁখি?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো আছে। আমাদের পুরো ক্লাসকে জন্মদিনের দাওয়াত দিয়েছে।"

"পুরো ক্লাসকে?"

"হ্যাঁ।"

আম্মু বললেন, "খুব বড়লোক ফেমিলি?"

"মনে হয়।"

ভাইয়া মুখ বাঁকা করে বলল, "বড়লোক হয়ে লাভ কী? টাকা দিয়ে কি আর কানা চোখ ভালো করতে পারবে?"

আমি ভাইয়ার কথা না শোনার ভান করে আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আঁখির জন্মদিনে কী উপহার দেয়া যায় আম্মু?"

ভাইয়া বলল, "একটা লাঠি।" তারপর হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব মজার কথা বলেছে।

আম্মু বললেন, "অন্য বন্ধুদের কী দিস?"

"বই। গল্পের বই।"

আম্মু বললেন, "আঁখিকেও তাই দে।"

আব্বু বললেন, "বাসার কেউ একজন পড়ে শোনাবে।"

"কয়েকজন কী ঠিক করেছে জান?"

"কী?"

"একটা গল্পের বই না দিয়ে সেটা পড়ে রেকর্ড করে ক্যাসেটটা দিবে।"

আব্বু বললেন, "ভেরি গুড আইডিয়া। হাউ ক্লেভার।"

আম্মু বললেন, "অন্য কিছু না পেলে খাবার জিনিস দে। খাবার জিনিস সবাই পছন্দ করে।"

আমারবই.কম
amarboi.com

"উঁহু।" আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "নাহ্! আঁখি কিছু খেতে চায় না। তার টিফিনগুলো অন্যেরা ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলে।"

ভাইয়া বলল, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।"

আমি ভাইয়ার দিকে তাকালাম, "কী আইডিয়া?"

"একটা সুন্দর দেখে আয়না দে।" কথা শেষ করে আবার হা হা করে হাসতে লাগল, আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। ভাইয়া চোখের সামনে আস্তে আস্তে কেমন যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে। বেশি মুখস্থ করলেই মনে হয় মানুষ বোকা হয়ে যায়।

দুপুর বেলা আমরা স্কুলের মাঠে সাতচাঁড়া খেলছি—তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় আইডিয়াটা এলো। অন্যান্য দিনের মতো আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি, আঁখি বসে বসে আমাদের খেলাটা উপভোগ করছে। মামুন মাত্র চাঁড়াটা ভেঙে দৌড়াচ্ছে আমি বল দিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করলাম, তাকে লাগাতে পারলাম না, বলটা আঁখির খুব কাছে ড্রপ খেয়ে তার কানের কাছে দিয়ে গেল, আঁখি তখন বলটা ধরার চেষ্টা করল। আরেকটু হলে ধরেই ফেলত—একটুর জন্যে পারল না। আঁখি না দেখেই বলটা প্রায় ধরে ফেলেছিল শব্দ শুনে। বলটা খুব কাছে ড্রপ খেয়েছে বলে সে শব্দটা শুনেছে। তার মানে যদি সব সময় বলটার ভিতরে একটা শব্দ হতে থাকে তা হলে আঁখি বলটা কোথায় বুঝতে পারবে। এরকম একটা বল যদি কিনতে পাওয়া যেত তা হলে আঁখিও আমাদের সাতে সাতচাঁড়া খেলতে পারত। আর সেই বলটা হত আঁখির জন্যে একেবারে সত্যিকারের উপহার।

পরদিন আমি মার্কেটের দোকানগুলোতে গেলাম খোঁজ নেয়ার জন্যে। আমার কথা শুনে তারা মনে হয় আকাশ থেকে পড়ল, অবাক হয়ে বলল, "বলের ভেতরে ঘণ্টা?"

"আমি বললাম ঘণ্টা কিংবা অন্য কিছু। ঘুঙুরও হতে পারে।"

দোকানের মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে ভাবছে আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"যারা চোখে দেখতে পায় না তারা খেলতে পারবে।"

মানুষটা মুখ বাঁকা করে বলল, "যারা চোখে দেখতে পায় না তারা খেলবে লুডু, বল কেন খেলবে?"

আমি মানুষটার সাথে তর্ক না করে একটা টেনিস বল কিনে আনলাম। যদি এরকম বল কিনতে পাওয়া না যায় তা হলে সেটা বানাতে হবে।

রাস্তার মোড়ে বড় বড় গোঁফের একজন কমবয়সী মুচি কাজ করে। আমি একদিন তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমি আগেই লক্ষ্য করেছি একজন মুচির সামনে দিয়ে যখন কেউ হেঁটে যায় তখন সে কখনো মানুষটার মুখের দিকে তাকায় না, সব সময় তার পায়ের দিকে তাকায়। কাজেই কমবয়সী মুচিটিও আমার পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল। আমি যেহেতু চলে যাই নি তাই শেষ পর্যন্ত মুচিটি আমার মুখের দিকে তাকাল। তখন আমি বললাম, "আমি কি আপনার সাথে একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে পারি?"

"কী জিনিস?"

আমি তখন তার সামনে বসে টেনিস বলটা দেখিয়ে বললাম, "এই টেনিস বলটা কেটে একটা জিনিস ঢুকিয়ে আবার কি সেটা ঠিক করে দেয়া যাবে?"

"কী জিনিস ঢুকাতে চাও?"

আমি পকেট থেকে কয়েকটা ঘুঙুর বের করে দিলাম, "এই যে এগুলো।"

মানুষটি ঘুঙুরগুলো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর টেনিস বলটা দেখে বলল, "এটা কেটে তারপর ঢোকাতে হবে। আমার কাছে খুব চিকন সুঁই আছে সেটা দিয়ে সেলাই করে দিতে পারি, কিন্তু শুধু সেলাই দিয়ে হবে না।"

"কেন হবে না?"

"বাতাস বের হয়ে গেলে তো বল লাফাবে না।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "তা হলে কীভাবে করা যাবে?"

"খুব ভালো আঠা দরকার। বিদেশী আঠা আছে খুব দামি। রবার প্লাস্টিক চামড়া সব জোড়া দিতে পারে।"

"আছে আপনার কাছে সেই আঠা?"

মানুষটা মাথা নাড়ল, "নাই। দেখি জোগাড় করতে পারি কি না।"

দামি আঠা কতো দামি সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "কতো খরচ পড়বে?"

আমারবই.কম

মানুষটা হাসল, বলল, "খরচ তো পরের কথা! আগে দেখতে হবে এটা সম্ভব কি না।"

"আমার কাছে তো টাকা বেশি নাই সেইজন্যে জানতে চাচ্ছিলাম।"

"গোলাপানের কাছে টাকা থাকার কথা না। আমি জানি।" মানুষটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার কাছে রেখে যাও, দেখি কী করা যায়।"

"কবে আসব?"

"কাল পরশু।"

কাজেই আমি মুচির কাছে টেনিস বলটা রেখে গেলাম। কমবয়সী মানুষটা সেটা নিয়ে গবেষণা করল, দুইদিন পর সত্যি সত্যি সে টেনিস বলটা আমাকে ফিরিয়ে দিল। ভিতরে চারটা ঘুঙুর—বলটা নাড়ালেই ঝুনঝুন শব্দ করে! আমার কানেই খুব স্পষ্ট শোনা যায় আঁখি নিশ্চয়ই আরো অনেক ভালো শুনতে পাবে! মুচির হাতের কাজ খুবই ভালো, সেলাইটা প্রায় দেখাই যায় না। তার উপরে এক ধরনের আঠা লাগিয়েছে। আমি টেনিস বলটা মাটিতে ড্রপ দিয়ে দেখলাম, ড্রপ খেয়ে উপরে উঠে এল, সাথে ঝুনঝুন শব্দ। এক কথায় একেবারে ফাটাফাটি।

মুচি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আমার খুশি খুশি ভাব দেখে সেও খুশি হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "এইটা দিয়ে কী করবে?"

"আমার এক বন্ধুকে দিব। জন্মদিনের উপহার।"

"অ।" মুচি মাথা নাড়ল, "তোমার বন্ধু ঝুনঝুন শব্দওয়ালা বল দিয়ে কী করবে?"

"চোখে দেখতে পায় না তো তাই তাকে খেলায় নিতে পারি না। এই বলটা থাকলে খেলায় নিতে পারব।"

"অ।" মুচি মাথা নাড়ল।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "কত দিতে হবে?" আমার বুকটা ভয়ে ধুকধুক করতে লাগল। যদি অনেক বেশি টাকা চেয়ে বসে তা হলে কেমন করে দিব?

মুচি বলল, "কিছু দিতে হবে না।" বলে সে একটা পুরোনো জুতায় পেরেক ঠুকতে শুরু করল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিছু দিতে হবে না?"

"না। তুমি তোমার বন্ধুরে দেও। সে খেলুক।"

"কিন্তু—কিন্তু—আপনার খরচ হয়েছে না? দামি বিদেশী আঠা কিনতে হয়েছে, কতো সময় লেগেছে।"

"ওইগুলা কিছু না। তোমার বন্ধু এইটা দিয়ে খেলবে চিন্তা করলেই আমার আনন্দ হবে। ধরে নাও এই আনন্দটাই আমার মজুরি।"

এইরকম একটা কথা বলার পরে তো আমি তাকে আর টাকা সাধতে পারি না। আমি তারপরেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, "আপনার নাম কী?"

মুচি মানুষটি জুতায় পেরেক ঠোকা বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "নাম দিয়ে কী করবে?"

"না মানে ইয়ে—" আমি নিজেও জানি না নাম দিয়ে কী করব!

মুচি মানুষটি আবার জুতায় পেরেক ঠোকা শুরু করে বলল, "আমাদের নাম থাকা না থাকা সমান কথা। আমার বউ আমাকে ডাকে, হ্যাঁগা, ছেলেমেয়ে ডাকে বাবা, পাবলিক ডাকে এই মুচি। কোনটা চাও, বল?"

আমি তখন বুঝতে পারলাম এই মানুষটা অন্যরকম, তাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। তাই তখন যেটা সহজ সেটাই করলাম, বললাম, "আপনাকে অনেক থ্যাংকু।"

মানুষটা তখন মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে তার বড় বড় গোঁফের ভিতর দিয়ে একটু হাসল।

আঁখির জন্মদিনে আমরা দল বেঁধে তার বাসায় হাজির হলাম, আমরা সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভালো কাপড় পরে এসেছি। সুজন পর্যন্ত মাথায় তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে এসেছে, হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। আমরা সবাইকে সব সময় স্কুলের ভিতরে স্কুলের পোশাকে দেখি, এখানে কেউ স্কুলের পোশাক পরে নেই তাই সবাইকে অন্যরকম লাগছে। সবচেয়ে বেশি অন্যরকম লাগছে মেয়েদের—তারা মনে হয় সেজেগুজে এসেছে, কাউকেই চিনতে পারি না। আমরা সবাই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে এসেছি, কেউ কেউ আমার মতো আলাদা কেউ কেউ রিতু-শান্তা সুমির মতো একসাথে। সবাই চেষ্টা করেছে উপহারটাকে সুন্দর করে রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে আনতে শুধু সুজনের উপহারটা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়ানো। তার যুক্তিটা ফেলে দেবার মতো না—যত সুন্দর কাগজ দিয়েই মোড়ানো হোক আঁখি তো আর সেটা দেখতে পাবে না।

আমারবই.কম
amarboi.com

আঁখিদের বাসাটি বিশাল, বাসার ভেতরে অনেক জায়গা। আঁখি দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের কেউ একজন এলেই সে আনন্দে চিৎকার করে উঠছে। আমি আসামাত্রই সে একটা চিৎকার দিল, "ও তিতু তুই এসেছিস! থ্যাংক্ থ্যাংক্।"

পাশে হালকা পাতলা একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, আঁখি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু, এই হচ্ছে তিতু। আমাকে প্রথম দিন স্কুলে যখন অপমান করছিল আমি যখন রেগেমেগে বের হয়ে আসছিলাম তখন তিতু সবার আগে লাফ দিয়ে উঠে বলেছিল দাঁড়াও!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুই সেটা জানিস?"

"জানব না কেন?" আঁখি হি হি করে হাসল, "আমি না চাইলেও সবকিছু শুনি! সবকিছু মনে থাকে!"

আঁখির আম্মু বললেন, "এসো বাবা। ভেতরে এসো।"

বাসাটা খুব সাজানো গোছানো। এটা সব সময়েই এরকম সাজানো গোছানো থাকে নাকি আঁখির জন্মদিনের জন্যে এভাবে সাজানো হয়েছে বোঝা গেল না। বিশাল বড় একটা ডাইনিং টেবিলের উপর খুব বড় একটা কেক। পিছনে একটা জন্মদিনের ব্যানার। ঘরের চারপাশে অনেক বেলুন। বাসায় অনেক মানুষ, বেশির ভাগেরই বয়স কম। যাদের বয়স একটু বেশি কম তারা ছোটাছুটি করছে। আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা একটু ভদ্র হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছে। আঁখির আত্মীয়স্বজন, চাচাতো মামাতো খালাতো ফুপাতো ভাইবোনেরাও এসেছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এক পাশে বসে নিজেরা নিজেরা গল্প করছি শুধু রিতু অপরিচিত ছেলেমেয়েদের সাথেও ভাব করে ফেলছে! আমি জানি আজকে জন্মদিনের শেষে যখন আমরা সবাই ফিরে যাব তখন এই বাসার সবাই শুধু রিতুর কথা মনে রাখবে।

এরকম সময় একজন মানুষ একটা গ্লাসের মাঝে চামুচ দিয়ে ঠুন ঠুন শব্দ করতে লাগলেন, আর সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল, আমরাও গেলাম। মানুষটাকে আমরা চিনতে পারলাম, আঁখির আব্বু, প্রথম দিন আঁখিকে নিয়ে আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। আঁখির আব্বু তখন গ্লাসে ঠুন ঠুন শব্দ বন্ধ করে বললেন, "আঁখির জন্মদিনে আসার জন্যে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা জন্মদিনের কেক কাটব তারপর আমাদের লাঞ্চ। লাঞ্চের পর জন্মদিনের উপহার খোলা হবে।"

সুজন হাত তুলে বলল, "কেকটা খালি কাটব? খাব না?"

সবাই হেসে উঠল, আঁখির আব্বুও হাসলেন, বললেন, "খাব, অবশ্যই খাব। এতো ভালো একটা কেক আনা হয়েছে সেটা আমাদের খেতে হবে। যখন জন্মদিনের উপহার খোলা হবে তখন কেকও খাওয়া হবে।"

কোনো কারণ ছাড়াই সবাই তখন আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আঁখির আব্বু বললেন, "কেক খেতে খেতে জন্মদিনের উপহার খোলার পর আমরা বড়রা সরে যাব। তখন তোমরা ছোটরা যেভাবে খুশি সময় কাটাতে পার। বাইরে খালি জায়গা আছে খেলতে পার, ভেতরে নাচানাচি করতে পার, লাফালাফি করতে পার। তোমাদের বাসা থেকে পারমিশান দেয়া থাকলে যতক্ষণ খুশি থাকতে পার। কীভাবে বাসায় যাবে সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি সবাইকে বাসায় পৌঁছে দেব।"

সবাই তখন আবার আনন্দের একটা শব্দ করল। আঁখির আম্মু হাত তুলে সবাইকে বললেন, "আমি জানি তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি খিদে পায়—তাই একটু পরে পরেই এই টেবিলে নাস্তা দেয়া হবে। তোমরা খাবে।"

সুজন আবার হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "কী কী নাস্তা দেওয়া হবে?"

সুজনের প্রশ্ন শুনে সবাই আবার হেসে উঠল, শুধু আঁখির আম্মু হাসলেন না, বললেন, "চানাচুর, চিপস, বিস্কুট, স্যান্ডউইচ, শিঙ্গাড়া, সমুচা, চিকেন নাগেট, মিষ্টি, ফলমূল, কোল্ড ড্রিংকস। তুমি যদি এর বাইরে আর কিছু চাও আমাকে বলতে পার।"

আঁখির আম্মুর লিস্ট শুনে সুজনের মতো মানুষও একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বলল, "না খালামা আর কিছু লাগবে না।"

আঁখির আব্বু বললেন, "তা হলে সবাই এসো, আমরা কেক কাটি।" আমরা ছোটাছুটি করে আঁখির পাশে দাঁড়ালাম, সাধারণত এরকম সময়ে অনেক মানুষ ছবি তোলে কিন্তু এখানে কেউ ছবি তুলছে না। আঁখি ছবি দেখতে পারে না সেজন্যেই মনে হয় ছবি তোলায় কারো উৎসাহ নেই। একজন মানুষ শুধু চুপচাপ একটা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ভিডিও করছে। কেকের উপর মোমবাতি লাগানো হল সেই মোমবাতি জ্বালানো হল তারপর হঠাৎ একজন সুর করে হ্যাপি বার্থ ডে গাইতে শুরু করল। আমরা সবাই তখন গলা মিলিয়ে হ্যাপি বার্থ ডে গাইতে লাগলাম। কেউ একজন বলল, "ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভাও।"

আমারবই.কম amarboi.com

আরেকজন চিৎকার করে বলল, "এক ফুঁয়ে নিভাতে হবে কিন্তু।"

এক ফুঁয়ে যদি নেভানো না যায় কেউ সেই ঝুঁকি নিল না। সবাই মিলে চারিদিকে দিয়ে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। তখন আঁখির হাতে একজন কেক কাটার ছুরি ধরিয়ে দিল, আঁখি বলল, "ওয়ান টু থ্রি", তারপর কেকটার মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলল। সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে আর তখন একজন কেকটা ভিতরে নিয়ে টেবিলে খাবার দিতে থাকে। কতো রকম খাবার, দেখে আমাদের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। খাবার দেখেই কি না জানি না আমাদের হঠাৎ করে সবার একসাথে খিদে লেগে গেল। আমরা তখন রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে প্লেটে খাবার নিতে থাকি গপগপ করে খেতে থাকি! একজন এর মাঝে টেবিলে মাংসের বাটি উল্টে ফেলল, একজনের হাত থেকে চপ নিচে পড়ে গেল, একজনের খাবার বোঝাই প্লেট মেঝেতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কোল্ড ড্রিংকসের বোতল থেকে ভুর ভুর করে ফেনা বের হয়ে এলো, কিন্তু কেউ সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামালো না।

আমাদের খাওয়া শেষ হবার পর বড়রা খেতে বসে। তখন লালচে চুলের একটা মেয়ে বলল, "সবাই বাইরের ঘরে এসো। এখন আঁখির গিফট খোলা হবে।"

সবাই হইহই করে বাইরের ঘরে হাজির হয়। আঁখি দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা কার্পেটের উপর বসে আর সবাই তখন তার উপহারগুলো তার সামনে এনে রাখতে থাকে। কতো রকম উপহার, ছোট বড় মাঝারি বাক্স, চকচকে রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ানো। লাল চুলের মেয়েটা সামনে বসে বড় একটা বাক্স তুলে উপরে লেখাগুলো পড়ে বলল, "এটা দিয়েছেন বড় খালাম্মা। হ্যাপি বার্থডে লেখা গিফট র‍্যাপ দিয়ে র‍্যাপ করেছেন।"

সবাই চিৎকার করে বলল, "বড় খালাম্মা। বড় খালাম্মা।"

আঁখি বাক্সটা খোলার চেষ্টা করে, আশেপাশে বসে থাকা ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চা টানাটানি করে তাকে সাহায্য করে, বাক্সটা খোলার পর ভেতর থেকে একটা টেডি-বিয়ার বের হয়ে আসে। আঁখি নরম তুলতুলে টেডি-বিয়ারটি বুকে চেপে একটু আদর করে বলল, "থ্যাংকু বড় খালা। থ্যাংকু।"

বড় খালা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, "তোকে যে কী দেব বুঝতে পারি না। তুই টেডি-বিয়ার পছন্দ করিস তাই প্রতি বছর একই জিনিস দিয়ে যাচ্ছি।"

আঁখি বলল, "বড় খালা এটাই আমার পছন্দ। থ্যাংকু।"

লালচে চুলের মেয়েটা আরেকটা বাক্স আঁখির হাতে তুলে দিল। আঁখি বাক্সটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা ইলেকট্রনিক গেম বের হয়ে এলো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দশ বারো বছরের ছেলে উত্তেজিত গলায় বলল, "আঁখি আপু এইটা মেমোরি গেম। তুমি একটা বাটন চাপ দিবে তখন একটা শব্দ হবে। সেটা মনে রেখে আরেকটা চাপ দিবে।"

আঁখি বলল, "থ্যাংকু লিটন।"

"আব্বু সিঙ্গাপুর থেকে এনেছে।"

"হাউ নাইস। মামাকে থ্যাংকু দিস লিটন।"

ছেলেটি গম্ভীর গলায় বলল, "দিব আঁখি আপু।"

আঁখির আত্মীয়স্বজনেরা সবাই নিশ্চয়ই খুব বড়লোক—প্রত্যেকটা বাক্স থেকেই খুব দামি দামি উপহার বের হতে থাকল। কোনোটা এমপিথ্রি প্লেয়ার, কোনোটা মোবাইল ফোন, কোনোটা ইলেকট্রনিক গেম, কোনোটা দামি কাপড়, কোনোটা সুন্দর জুতো, কোনোটা মুক্তার মালা—এমন কিছু নেই যেটা সে উপহার হিসেবে পায় নি।

বাক্সগুলো খুলতে খুলতে হঠাৎ করে আমাদের একটা প্যাকেট বের হল। লালচে চুলের মেয়েটা প্যাকেটের উপর লেখা দেখে পড়ল, "আঁখি আপু এটা দিয়েছে তোমার স্কুলের তিনজন বন্ধু—রিতু, শান্তা, আর সুমি। প্যাকেটটা খুব সুন্দর লাল কাগজ দিয়ে সাজিয়েছে।"

আঁখি প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুলতেই ভেতর থেকে অনেকগুলো সিডি বের হল। আঁখি হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে কীসের সিডি, তখন রিতু বলল, "আঁখি আমরা দশটা গল্প বই রেকর্ড করে দিয়েছি। একটা ভূতের, দুইটা সায়েন্স ফিকশান অন্যগুলো অ্যাডভেঞ্চার!"

আঁখি আনন্দে চিৎকার করে বলল, "থ্যাংকু থ্যাংকু তোদের। থ্যাংকু।" তারপর সিডিগুলো খানিকক্ষণ বুকে চেপে রেখে বলল, "তোরা কখন এগুলো করলি?"

রিতু বলল, "আস্তে আস্তে করেছি। আমার ভাইয়া সিডিতে রাইট করে দিয়েছে।"

শান্তা বলল, "আমরা নিজেরা পড়েছি তো তাই উচ্চারণগুলো কিন্তু আমাদের মতন।"

আঁখি বলল, "সেটাই তো সবচেয়ে ভালো। আমি যখন শুনব তখন মনে হবে তোরা পাশে বসে আছিস!"

আমারবই.কম amarboi.com

আরো কয়েকটা প্যাকেট খোলার পর আঁখি আমার ছোট বাক্সটা হাতে নিল। সেটা একটু ঝুনঝুন শব্দ করে উঠল, আঁখি তখন সেটা কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, "এটা কী?"

লালচে চুলের মেয়েটা বলল, "এটা দিয়েছে তিতু।"

আঁখি জিজ্ঞেস করল, "এটা কী তিতু?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "খুবই হাস্যকর একটা জিনিস! তোর এতো সুন্দর সুন্দর গিফটের সাথে এটা না খুলে পরে খুলিস।"

লালচে চুলের মেয়েটা বলল, "না না! সব এখনই খুলতে হবে।"

আঁখি বাক্সটা খুলতেই টেনিস বলটা বের হয়ে এলো। আঁখি বলটা হাতে নিয়ে নাড়াতেই সেটা ঝুন ঝুন শব্দ করে উঠল, সাথে সাথে আঁখি ইলেকট্রনিক শক খাওয়ার মতো চমকে ওঠে, "এটা কোথায় পেয়েছিস?"

"পাই নি। তৈরি করেছি।"

"তৈরি করেছিস?" আঁখি উত্তেজিত গলায় বলল, "তুই তৈরি করেছিস?"

"আমি নিজে তৈরি করি নি—একজন আমাকে তৈরি করে দিয়েছে।"

"কী আশ্চর্য!" আঁখি বলটা দুই হাতে ধরে বুকে চেপে রাখল। তাকে দেখে মনে হয় সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। যারা আঁখিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা এখনো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। দামি দামি উপহার পেয়ে আঁখি ভদ্রতার কথা বলে সেগুলি পাশে রেখে দিয়েছে—আর এই অতি সাধারণ টেনিস বল পেয়ে সে কেন এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কেউ বুঝতে পারছে না।

আঁখি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "আম্মু আব্বু দেখে যাও আমি কী পেয়েছি!"

আঁখির আম্মু আর আব্বু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন, "কী পেয়েছিস মা?"

"এই দেখো, ঝুনঝুনি টেনিস বল।" কেন এই টেনিস বলটা পেয়ে সে উত্তেজিত সেটা বোঝানোর জন্যে বলটা উপরে ছুড়ে দেয়, সেটা ঝুনঝুন শব্দ করে উপরে উঠে যখন আবার ঝুনঝুন শব্দ করে নেমে আসে সে শব্দটা লক্ষ্য করে বলটা খপ করে ধরে ফেলল।

হঠাৎ করে সবাই এই বলটার গুরুত্বটা ধরতে পারে আর সবাই একসাথে বিস্ময়ের শব্দ করল। আঁখিকে ঘিরে থাকা ছেলেমেয়ের ভেতরে একজন বলল, "বলটা আমার দিকে ছুড়ে দাও আপু!"

আঁখি বলটা ছুড়ে দিল। ছেলেটা বলটা ধরে বলল, "এখন তুমি ধরো।"

ছেলেটা বলটা আঁখির দিকে ছুড়ে দেয়, আঁখি সত্যি সত্যি বলটাকে ধরে ফেলল। সবাই তখন আনন্দে চিৎকার করে উঠল! আঁখি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এখন তোদের সাথে সাতচাঁড়া খেলতে পারব!"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ। সেজন্যেই তো তৈরি করেছি।"

আঁখি বলল, "তিতু তুই একটা জিনিয়াস!" তারপরে সে আমাকে আনন্দে জাপটে ধরল।

আঁখির আম্মু ডাইনিং টেবিলে একটু পর পর অনেক রকম খাবার রেখে যেতে লাগলেন কিন্তু আমরা খাওয়ার জন্যে ভেতরে এলাম না। আঁখিকে নিয়ে সাতচাঁড়া খেললাম।

সে যে খুব সাংঘাতিক প্লেয়ার তা না, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার সে একটা বল নিয়ে ছোটাছুটি করে খেলছে!

আমারবই.কম amarboi.com

৭

যখন আমাদের স্কুলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল এবং সেখানে এমন ব্যাপার ঘটল যেটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না

এসেমবলিতে দাঁড়িয়ে নতুন ম্যাডাম বললেন, "সামনের সপ্তাহ থেকে আমাদের স্কুলে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে।"

ছেলেরা আনন্দের মতো শব্দ করল এবং মেয়েরা হতাশার মতো শব্দ করল। যখন শব্দ কমে এলো তখন ক্লাস নাইনের একটা মেয়ে বলল, "আমাদের জন্যে কী খেলা হবে ম্যাডাম?"

ম্যাডাম বললেন, "পরের বার আমরা মেয়েদের জন্যে আলাদা করে ক্রিকেট হ্যান্ডবল কিংবা অন্য কোনো খেলা শুরু করব। এবারে ছেলেদের সাথে খেলবে। ছেলে এবং মেয়ে মিলে যৌথ ক্রিকেট।"

সব ছেলেরা হইহই করে উঠল এবং বলার চেষ্টা করল যে মেয়েরা মোটেও ক্রিকেট খেলতে পারে না। মেয়েরা হইহই করে উঠল এবং বলার চেষ্টা করল যে ছেলেরা মোটেও তাদের খেলায় নেবে না। ম্যাডাম শান্তমুখে অভিযোগটা শুনে বললেন, "তোমরা যদি মনে কর আমি এই স্কুলের মাঠে খুব ভালো ক্রিকেট খেলা দেখতে চাই তা হলে জেনে রাখ সেটা সত্যি নয়। ভালো ক্রিকেট খেলা দেখতে চাইলে আমি শহরের স্পোর্টস ক্লাবকে বলতাম তাদের টিম নিয়ে এই মাঠে খেলতে—তারা তোমাদের থেকে অনেক ভালো ক্রিকেট খেলে! ঠিক কি না?"

ম্যাডাম কোন লাইনে কথা বলতে চাইছেন বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সেটা ধরতে পারল না তাই তারা হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই বলল না। শেষ

পর্যন্ত কী বলেন সেটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। ম্যাডাম বললেন, "আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করছি—" থেমে গিয়ে হাত তুলে পুরো স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বললেন, "তোমাদের খেলা দেখার জন্যে। ভালো হোক খারাপ হোক কিছু আসে যায় না। খেলাটা হতে হবে তোমাদের। বুঝেছ?" ছেলেমেয়েরা মাথা নাড়ল। ম্যাডাম বললেন, "আমি চাই তোমরা সবাই খেলো এবং তোমাদের ভেতর যারা ভালো খেলতে পার তারা মিলে টিম তৈরি কর। সেই টিমে ছেলে আর মেয়ে দুইই থাকতে হবে।"

ম্যাডাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমরা কেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু করেছি কে বলতে পারবে?"

ক্লাস টেনের একজন ছেলে বলল, "বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম খুব ভালো সেইজন্যে আমরাও যেন ভালো হতে পারি সেইজন্যে।"

"উঁহু। হয় নি।"

সুজন বলল, "ক্রিকেট খেলায় মারামারি কম হয়। সেইজন্যে।"

ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে বললেন, "কোন খেলায় মারামারি বেশি হয়?"

"ফুটবল খেলায়।" সুজন একগাল হেসে যোগ করল, "ক্রিকেট থেকে আমার ফুটবল খেলাটা সব সময় বেশি ভালো লাগে।"

"সেটা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় মারামারি কম হয় মোটেও সেইজন্যে আমরা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু করছি না। অন্য কারণ আছে।"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "অন্য কী কারণ ম্যাডাম?"

ম্যাডাম বললেন, "মানুষের অনেক ধরনের বুদ্ধিমত্তা আছে, কিন্তু এই স্কুলে আমরা শুধু একটা বুদ্ধিমত্তার টেস্ট করি। সেটা হচ্ছে লেখাপড়ার বুদ্ধিমত্তার। লেখাপড়ার বাইরে অন্য যে বুদ্ধিমত্তা আছে আমরা সেগুলোর খোঁজ নিই না, সেগুলোর গুরুত্ব দেই না সেগুলো বাড়ানোরও চেষ্টা করি না। সেই বুদ্ধিমত্তাগুলো লেখাপড়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ—অনেক সময় লেখাপড়া থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা আস্তে আস্তে তোমাদের মাঝে সেই বুদ্ধিমত্তাগুলো খুঁজব। সেটা শুরু করছি একটা খেলা দিয়ে—আস্তে আস্তে আমরা অন্য কিছুও করব। গান, কবিতা আবৃত্তি, সায়েন্স ফেয়ার, নাটক, ডিবেট, ছবি আঁকা, দাবা খেলা, স্পোর্টস, দৌড়ঝাঁপ, বই পড়া আমরা সবকিছু শুরু করব। দেখবে

আমারবই.কম amarboi.com

তোমাদের সবারই নিজস্ব একটা ক্ষেত্র আছে। আমরা যার যার ক্ষেত্রের নায়কদের খুঁজে বের করব—নায়িকাদের খুঁজে বের করব।"

সবাই যখন "নায়ক নায়ক নায়িকা নায়িকা" করে চিৎকার করছে তখন সুজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দুষ্টুমির একটা কম্পিটিশন থাকলে কী মজা হত। তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "তুই তা হলে শুধু স্কুলে না, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবি।"

ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রিকেট টিম নিয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে?"

ক্লাস টেনের বড় একটা ছেলে জিজ্ঞেস করল, "ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কি ক্রিকেট বল দিয়ে হবে নাকি টেনিস বল দিয়ে?"

ম্যাডাম আমাদের ড্রিল স্যারের দিকে উত্তরের জন্যে তাকালেন। ড্রিল স্যার বললেন, "ছোট ছোট বাচ্চারাও খেলবে তাই শুরু হবে টেনিস বল দিয়ে।"

ছেলেদের ভিতর যারা ভালো ক্রিকেট খেলে তারা যন্ত্রণার মতো শব্দ করল।

দুপুর বেলা আমরা আঁখিকে নিয়ে তার ঝুনঝুন টেনিস বল দিয়ে সাতচাঁড়া খেলছি—এরকম সময় বজলু ঘাড়ে একটা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে হাজির। হাত তুলে বলল, "থাম।"

আমরা থামলাম। মামুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বজলু বলল, "ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্যে টিম তৈরি করতে হবে।"

মামুন বলল, "আমরা কোনোভাবেই ক্লাস নাইনের সাথে পারব না। ওরা খুব ভালো ক্রিকেট খেলে।"

রিতু বলল, "না পারলে নাই।"

সুজন বলল, "কারা কারা ভালো খেলে আমাকে বলে দিস। আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

রিতু ভুরু কুঁচকে বলল, "কী ব্যবস্থা করবি?"

সুজন বলল, "খেলার সময় দেখবি তারা শুধু বদলা নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছে আর বের হচ্ছে।" ব্যাপারটা চিন্তা করেই সুজনের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

বজলু বলল, "বাজে কথা বলে লাভ নাই। আমাদের টিম তৈরি করতে হবে, তারপর প্র্যাকটিস করতে হবে।"

মামুন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের ক্রিকেট টিম তৈরি করে লাভ নাই, আমাদের ক্লাসে কেউ ক্রিকেট খেলতে পারে না।"

বজলু বলল, "ভালো খেলতে হলে বেশি করে খেলতে হয়। তোরা কেউ ক্রিকেট খেলবি না, দিন রাত সাতচাঁড়া খেলবি তা হলে কেমন করে হবে?"

আমি বললাম, "ক্রিকেট টুর্নামেন্ট না হয়ে সাতচাঁড়া টুর্নামেন্ট হলে কেউ আমাদের সাথে পারত না।"

বজলু মুখ শক্ত করে বলল, "সাতচাঁড়া টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। হচ্ছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।"

সুজন বলল, "আমরা নূতন ম্যাডামকে গিয়ে বলতে পারি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বদল সাতচাঁড়া টুর্নামেন্ট করতে।"

বজলু বলল, "বাজে কথা বলবি না।"

মামুন হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "টুর্নামেন্টে আমরা যে লাড্ডা গাড্ডা। ক্লাস টুয়ের কাছে হেরে যাব। আমাদের ক্লাসে কেউ ক্রিকেট খেলতে পারে না।

বজলু বিরক্ত হয়ে বলল, "ত্যাদর ত্যাদর না করে খেলতে আয়।"

কাজেই আমাদের সাতচাঁড়া বন্ধ করে ক্রিকেট খেলা শুরু করতে হল। মামুনের কথা সত্যি আমাদের ক্লাসে বজলু ছাড়া আর কেউ ক্রিকেট খেলতে পারে না। যখন বল করতে বলা হয় তখন বলটি স্ট্যাম্প থেকে দশ হাত দূর দিয়ে যায়। যখন ব্যাট করতে হয় তখন ব্যাট ঘুরিয়ে মারার পর দেখা যায় বল তার জায়গাতেই আছে আমরা ব্যাটটা বলকে লাগাতেই পারি নি! আমরা অবিশ্যি হাল ছাড়লাম না প্র্যাকটিস করতে লাগলাম।

পরের দিন খেলা শুরু করার আগে বজলু বলল, "খামোখা সবাইকে নিয়ে না খেলে টিম তৈরি করে ফেলি। যারা টিমে থাকবে তারা প্র্যাকটিস করুক।"

আমরা রাজি হলাম। সাতজনের টিমে কমপক্ষে তিনজন মেয়ে থাকতে হবে। রিতু আর শান্তা টিমে থাকতে রাজি হল কিন্তু আর কাউকেই রাজি করানো গেল না। সুমি বলল দূর থেকে একজন ছুটে এসে তার দিকে বল ছুড়ে দিচ্ছে দেখেই নাকি তার বুক ধড়াস ধড়াস করে। মিতু বলল ব্যাডমিন্টন হলে সে

আমারবই.কম amarboi.com

খেলতে রাজি আছে কিন্তু ক্রিকেট খেলতে রাজি না। লিপি বলল রোদের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করে ক্রিকেট খেললে তার মাথা ধরে যায়। মাধুরী ক্রিকেট খেলার কথা শুনে হাসতে হাসতেই গড়াগড়ি খেল। আমি তখন বললাম, "আঁখিকে নিয়ে নিই।"

সবাই অবাক হয়ে বলল, "আঁখি?"

"হ্যাঁ। আঁখি যখন ব্যাট করবে তখন ঝুনঝুন বলটা দিয়ে বল করলেই হবে।"

রিতু বলল, "আঁখি, তুই খেলবি?"

আঁখি বলল, "আমি জীবনে ক্রিকেট খেলি নাই।"

বজলু বলল, "কেউই খেলে নাই।"

আঁখি বলল, "এমনিতে আমি চেষ্টা করতে পারি কিন্তু টুর্নামেন্টে খেলা ঠিক না। টুর্নামেন্টে আসল প্লেয়ারদের খেলা উচিত। আমাদের ক্লাসের প্রেস্টিজ।"

বজলু বলল, "আমাদের কোনো আসল প্লেয়ার নাই।"

মামুন বলল, "সব ভুয়া।"

আমি বললাম, "তুই ব্যাট নিয়ে দাঁড়া। আমরা বল করে দেখি তুই পারিস কি না।"

আঁখি ইতস্তত করতে লাগল, তারপরেও আমরা তাকে ব্যাটসহ দাঁড়া করিয়ে দিলাম। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা হল একটু অন্যরকম কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। বজলু অন্যপাশ থেকে বল করতে গেল। প্রথম বলটা আঁখি মারার চেষ্টা করল না, মনে হল কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল ঝুনঝুন শব্দ করে বলটা কোন দিকে কত দূরে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বলটা আসতেই সে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ ব্যাট ঘুরিয়ে মেরে বসল। সত্যি সত্যি ব্যাটটা বলে লেগে যায় আর বলটা ঝুনঝুন শব্দ করে রীতিমতো আকাশে উড়ে গেল। আমরা সবাই হাততালি দিতে লাগলাম, বজলু বলল, "ফাটাফাটি ব্যাটসম্যান! একেবারে ফাটাফাটি!"

আঁখি হেসে বলল, "ঝড়ে বক পড়েছে!"

রিতু বলল, "দেখি ঝড়ে কতো বক পড়ে।"

বজলু আবার বল করল, এবার আগের থেকে জোরে আর কী আশ্চর্য আঁখি সত্যি সত্যি আবার বলটাকে মেরে বসল। যদি সত্যিকারের খেলা হত তা হলে সেটা হত রীতিমতো বাউন্ডারি।

রিতু বলল, "ব্যস ব্যস হয়ে গেছে। আমরা টিম মেম্বার পেয়ে গেছি। আঁখি হবে তিন নম্বর মেম্বার।"

আঁখি মাথা নেড়ে আপত্তি করে বলল, "না না। এটা মোটেই ঠিক হবে না। একটা সত্যিকারের টুর্নামেন্টে আমি খেলব কেমন করে?"

আমি বললাম, "কেন? তুই খেললে সমস্যা কী?"

আঁখি বলল, "সেটা যদি তোরা না বুঝিস তা হলে আমি কেমন করে বোঝাব?"

রিতু বলল, "এত বোঝাবুঝির দরকার নাই। টুর্নামেন্টে আমাদের জেতারও দরকার নাই। আমাদের একটা টিম হলেই হল—আর কিছু চাই না।"

ড্রিল স্যার আমাদের টিমের নাম দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন, "আঁখি? আঁখি তোদের টিমে খেলবে?"

বজলু বলল, "জি স্যার?"

"কেমন করে খেলবে?"

"আঁখির একটা টেনিস বল আছে সেটা ঝুনঝুন শব্দ করে। আঁখি যখন ব্যাট করবে তখন সেটা দিয়ে বল করতে হবে।"

ড্রিল স্যার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, বললেন, "না না। এটা হয় না। একটা মেয়ে চোখে দেখতে পায় না সে কেমন করে ক্রিকেট খেলবে? মেয়েটা ব্যথা পেয়ে যাবে।"

"না স্যার পাবে না।"

"তোদের ক্লাসে তো আরো মেয়েরা আছে। তাদের কাউকে টিমে নে।"

আমি বললাম, "না স্যার। আমরা অন্য মেয়েদের নিতে চাই না। আমরা আঁখিকে নিয়েই খেলতে চাই।"

আগে হলে ড্রিল স্যার এক ধমক দিয়ে বিদায় করে দিতেন। আজকাল কেউ সেটা করে না, ড্রিল স্যার বললেন, "আমি জানি না। ম্যাডামের সাথে কথা বলতে হবে।"

নূতন ম্যাডাম এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় বলে দিলেন আমাদের টিম যখন ফিল্ডিং করবে তখনো এই ঝুনঝুন বলটা দিয়ে খেলতে হবে। দুপুর বেলা যখন আমাদের টিম প্র্যাকটিস করছে তখন ম্যাডাম আমাদের দেখতে এলেন, বলটা খুব কৌতূহল নিয়ে দেখলেন। এটা আমার আইডিয়া শুনে এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি একজন আইনস্টাইন না হয় বিল

আমারবই.কম amarboi.com

গেটস! বলটা কীভাবে তৈরি করিয়েছি সেটাও শুনলেন, মুচি কোনো পয়সা নেয় নি শুনে যতটুকু অবাক হলেন তার থেকে বেশি খুশি হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "দেখেছ, সাধারণ মানুষেরা কতো সুইট?"

যেদিন আমাদের টুর্নামেন্ট শুরু হল সেদিন দুপুরের পর ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। আমরা সব মাঠের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। প্রথম খেলা ক্লাস নাইনের সাথে ক্লাস টেনের। ক্লাস নাইনের দুইজন খুব ভালো ক্রিকেট খেলে কিন্তু কী কারণ কে জানে দুইজনেই খেলার শুরুতেই ক্যাচ তুলে আউট হয়ে গেল। এরপর তারা অনেক টেনেটুনে দশ ওভারে বাইশ রান করে অলআউট। ক্লাস টেন ব্যাট করতে এসে কিছুতেই রান করতে পারে না, আমরা ভেবেছিলাম তারা বুঝি হেরেই যাবে। কিন্তু ক্লাস নাইনের খুবই কপাল খারাপ, সোজা সোজা ক্যাচগুলি ধরতে পারল না। অনেকগুলো নো বল করল তাই শেষ পর্যন্ত ক্লাস টেন জিতে গেল।

ক্লাস সিক্স আর সেভেন মিলে একটা টিম, বিকেল বেলা তাদের সাথে আমাদের ক্লাস এইটের খেলা। টসে সিক্স সেভেন জিতে গিয়ে তারা ব্যাট করতে নেমেছে। দুইটা আলাদা আলাদা ক্লাস মিলে একটা টিম করেছে নিজেদের ভিতরে বোঝাবুঝি হয় নি। তা ছাড়া ক্লাস সেভেনের ছেলেমেয়েগুলো ক্লাস সিক্সের ছেলেমেয়েগুলোর উপর একটু মাতব্বরি করার চেষ্টা করল। তাই তাদের খেলা হল খুবই খরাপ। মাত্র বারো রানে তারা অলআউট। আমাদের বজলু আর আশরাফ খেলতে নেমে দুইজনই দুই ওভারে বারো রান করে ফেলল। এতো সহজে আমরা জিতে যাব বুঝতে পারি নি! পুরো স্কুলই জেনে গিয়েছে আঁখি আমাদের টিমে খেলবে, তার খেলা দেখার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছিল কিন্তু তার ব্যাট করার জন্যে মাঠে নামতেই হল না।

পরের দিন আমাদের ফাইনাল খেলা। আমাদের খেলতে হবে ক্লাস টেনের সাথে। তাদের সাথে হেরে গেলেও আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না, আজকে ছোট ক্লাসের কাছে হেরে যাই নি। তাতেই আমরা খুশি!

বিকেল বেলা বাসায় যাবার সময় রাস্তার পাশে আমার সেই কম বয়সী মুচির সাথে দেখা। একটা পুরোনো চামড়ার স্যান্ডেল দুই পায়ে চেপে ধরে সে সেলাই করছে। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে তাকাল। আমাকে দেখে বলল, "কী খবর?"

"খবর ভালো।"

"তোমার সেই ঝুনঝুন বল কি আছে, নাকি কেটে গেছে?"

"না না ফেটে যায় নি। খুব ভালো কাজ করছে।"

"বাহ!"

আমি বললাম, "সেই বল দিয়ে আমরা এখন টুর্নামেন্ট খেলছি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। যার জন্যে বলটা বানিয়েছিলাম সেও কালকে টুর্নামেন্টে আপনার তৈরি করা বলটা দিয়ে খেলবে।"

মানুষটি বলল, "বাহ! বাহ! কে জিতেছে বলে যেও।"

আমি মাথা নাড়লাম, "বলব। বলে যাব।"

পরের দিন ফাইনাল খেলা নিয়ে আমাদের মাঠে প্রচণ্ড উত্তেজনা। মাঠের এক পাশে একটা টেবিলে একটা বড় আরেকটা ছোট কাপ রাখা হয়েছে। পাশে অনেকগুলো চেয়ার সেখানে স্যার ম্যাডামরা বসেছেন। উপরে শামিয়ানা টানানো হয়েছে, এক পাশে ব্ল্যাকবোর্ডে স্কোর লেখার ব্যবস্থা। দেখে মনে হয় বুঝি রীতিমতো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা!

খেলার শুরুতে দুই ক্লাসের টিম মাঠে গেল, নূতন ম্যাডাম আর ড্রিল স্যার তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। দুই টিম মিলে লটারি করা হল, লটারিতে আমরা জিতে গেলাম, বজলু তখন ক্লাস টেনকে ব্যাট করতে দিল।

সুজন উইকেটকিপার, বজলু প্রথমে বল করবে। আশরাফ আর মামুন মাঠের ডান পাশে, রিতু আর আঁখি বাম পাশে। শান্তা উইকেটকিপারের পিছনে।

ড্রিল স্যার বাঁশি দিলেন, সাথে সাথে খেলা শুরু হল। ক্লাস টেনের বড় বড় দুজন ছেলে ব্যাট করতে এসেছে। বজলু বল করল, ব্যাটসম্যান ঘুরিয়ে মারল সাথে সাথে বাউন্ডারি! ক্লাস টেনের ছেলেমেয়েরা আনন্দে লাফাতে থাকে আমাদের মুখ চুন। বজলু আবার বল করল, ছেলেটা আবার ঘুরিয়ে মারল, আবার বাউন্ডারি হয়েই যেত শেষ মুহূর্তে আশরাফ ঠেকিয়ে ফেলল। তার মাঝে ছেলেটি দুই রান করে ফেলেছে। ক্লাস টেনের ছেলেমেয়েরা আবার লাফাতে থাকে। বজলু আবার বল করল, ছেলেটা আবার ঘুরিয়ে মারল,

আমারবই.কম amarboi.com

বল আকাশে উঠে যায়, এবারে নির্ঘাত ছক্কা! কিন্তু ছক্কা হল না আমাদের রিতু ক্যাচ ধরে ফেলল। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে, আমরা চিৎকার করে লাফিয়ে কুঁদিয়ে মাঠ গরম করে ফেললাম। ড্রিল স্যার বাঁশি বাজিয়ে আমাদের মাঠ থেকে বের করে দিলেন, আবার খেলা শুরু হল। বেঁটে মতন একটা ছেলে ব্যাট করতে এসেছে, এতো তাড়াতাড়ি আউট হয়ে তারা এবারে খুব সাবধানে খেলতে লাগল।

আঁখি যেখানে ফিল্ডিং দিচ্ছে আমরা তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। ঝুনঝুন বলটা যখন কাছে আসে তখন আঁখি তার শব্দ শুনতে পায়, যখন দূরে থাকে তখন সে কিছুই বলতে পারে না। আমরা আঁখির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলাম। যখন বলটা তার দিকে আসছে তখন চিৎকার করে তাকে সাবধান করি, বলি, "আঁখি আসছে, বল আসছে।" কিংবা বলি "একটু ডান দিকে" বা "একটু বাম দিকে!" আঁখি তখন ডানে বামে গিয়ে বলটা ধরে ফেলে। আঁখির কারণেই স্কুলের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে আমাদের পক্ষে। তাই আশরাফ বল করে যখন ক্লাস টেনের একটা ছেলেকে বোল্ড আউট করে ফেলল তখন পুরো স্কুল আনন্দে চিৎকার করে উঠে নাচানাচি করতে লাগল।

দশ ওভারের খেলা, পাঁচ ওভারে সাতাশ রান হল, এভাবে খেলা চললে ক্লাস টেন প্রায় ষাট রান করে ফেলবে। কিন্তু দেখা গেল ছেলেরা আউট হয়ে যাবার পর তাদের খেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমাদের টিমের মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলে কিন্তু ক্লাস টেনের মেয়েরা একেবারেই লুতুপুতু। নিয়ম করে দেওয়া আছে যে প্রতি টিমে তিনজন মেয়ে থাকতে হবে সেজন্যেই তাদের রাখা হয়েছে কিন্তু তারা একেবারেই খেলতে পারে না। আমাদের রিতু একাই বল করে দুজনকে বোল্ড আউট করে ফেলল। শেষ মেয়েটা যখন রানআউট হয়েছে তখন তাদের মোট রান বত্রিশ।

আমাদের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নামল বজলু আর রিতু। দুজনেই খুব ভালো খেলতে লাগল। আমরা চেঁচিয়ে মাঠ গরম করে রাখলাম। আমাদের স্কুলে এমনিতে বাইরের মানুষ আসতে পারে না, আজকে খেলা উপলক্ষে বাইরের মানুষকে আসতে দেওয়া হয়েছে। মাঠে তাই অনেক ভিড়। শুধু মানুষজন নয় ঝালমুড়ি চিনাবাদাম আর আমড়াওয়ালারাও চলে এসেছে। আমি হঠাৎ করে অবাক হয়ে দেখি মাঠের এক কোনায় আমার সেই কমবয়সী

মুচি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে খেলার খবর শুনে সেও তার কাজ বন্ধ করে খেলা দেখতে চলে এসেছে। আমাদের দলের কেউ রান করলেই আর মুখে হাসি ফুটে উঠছে সে জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। প্রথম দিকে আমরা খুবই ভালো খেলছিলাম কিন্তু মাঝামাঝি সময়ে আমাদের খেলায় ধস নামল। একজন মাঠে যায় আর আউট হয়ে ফিরে আসে। দেখতে দেখতে আমরা সবাই আউট হয়ে গেলাম, বাকি আছে শুধু আঁখি। আমাদের তখন মাত্র তেইশ রান হয়েছে। মাঠে আছে সুজন আর আঁখি। তারা দুজন মিলে দশ রান করতে পারবে সেরকম আশা নেই। ক্লাস টেনের একটা ছেলে দুর্দান্ত বল করে, সেই বলের সামনে দাঁড়ানোই মুশকিল।

আঁখি যখন মাঠে খেলতে নেমেছে তখন পুরো স্কুল তার জন্যে হাততালি দিতে থাকে। রিতু তাকে মাঠে নিয়ে স্ট্যাম্পের সামনে দাঁড়া করিয়ে দিল। রিতু সেখানে দাঁড়িয়ে কান পেতে চার পাশে কী হচ্ছে শোনার চেষ্টা করল, তারপর খেলার জন্যে প্রস্তুত হল। বোলার ছুটে এসে বল করল, স্ট্যাম্প থেকে বেশ দূর দিয়ে বল এসেছে আঁখি তাই খেলার চেষ্টা করল না। পরের বলটা এলো একেবারে স্ট্যাম্পের সোজাসুজি, আঁখি শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে তারপর ব্যাট ঘুরিয়ে মেরে বসে, আর কী আশ্চর্য সেটা বাউন্ডারি হয়ে গেল।

পুরো স্কুল আনন্দে চিৎকার করে উঠে। আমরা সবাই লাফাতে থাকি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি নাচতে থাকে। ক্লাস টেনের ছেলেমেয়েদের মুখ কালো হয়ে যায়, আঁখি যদি এভাবে বাউন্ডারি মারতে থাকে তা হলে তাদের সম্মানটা থাকে কেমন করে।

আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ক্লাস টেনের সব ছেলেমেয়েরা আঁখির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়িয়েছে প্রথমে বুঝতে পারি নি, বোলার বল করার সাথে সাথে আমি কারণটা বুঝতে পারলাম। আঁখি বল দেখতে পায় না তাকে খেলতে হয় ঝুনঝুন শব্দ শুনে। ক্লাস টেনের ছেলেমেয়েরা আঁখিকে সেই শব্দ শুনতে দিবে না, যখনই বল আসতে থাকে তখন তারা সবাই চিৎকার করতে থাকে শব্দ করতে থাকে। তাদের এই কাজকর্ম দেখে আমরা ছুটে ড্রিল স্যারের কাছে গিয়ে নালিশ করলাম, স্যার এসে তাদের নিষেধ করলেন কিন্তু কোনো লাভ হল না তারা শব্দ করতেই লাগল। মাঠ বোঝাই মানুষজন তাদেরকে শান্ত করা চারটি খানি কথা নয়।

আঁখি অত্যন্ত বিপজ্জনক দুটি বল টিকে গেল। এই ওভারের শেষ বলটি যদি টিকে যায় তা হলে সুজন ব্যাট করতে পারবে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে আছি। ক্লাস টেনের দুর্দান্ত বোলার বল করল, বলটা সোজাসুজি স্ট্যাম্পের দিকে যাচ্ছে, আঁখি শুনতে পাচ্ছে কী না আমরা জানি না। আমরা দেখলাম ব্যাট তুলে সে মেরে বসেছে, আর কী আশ্চর্য, ঝুনঝুন বলটা একেবারে আকাশে উঠে গেল। ক্যাচ ধরার জন্যে একটা লম্বা ছেলে ছুটছে কিন্তু বল একেবারে সীমানার বাইরে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমাদের আঁখি ছক্কা মেরে দিয়েছে! আমরা জিতে গেছি। চিৎকার করতে করতে আমরা মাঠে ঢুকে গেলাম, আঁখিকে ঘাড়ে তুলে আমরা আনন্দে লাফাতে লাগলাম— আঁখি চিৎকার করতে লাগল, "ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে। আমি পড়ে যাব তো!"

আমরা কেউ তার চিৎকারে কান দিলাম না!

খেলা শেষ, এখন পুরস্কার বিতরণী। আমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাদের নূতন ম্যাডাম পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার দেবার আগে দুই একটা কথা বলতে হয় তাই ম্যাডাম হাত তুলে আমাদের থামালেন, তারপর কথা বলতে শুরু করলেন। ম্যাডাম বললেন, "আমরা অনেক ক্রিকেট খেলা দেখেছি কিন্তু আজকের খেলাটা ছিল একেবারে অন্যরকম, কেন তোমরা বলতে পারবে?"

আমরা চিৎকার করে বললাম, "আমরা জিতেছি সেইজন্যে!"

ম্যাডাম বললেন, "না। খেলায় তো একদল জিতবেই সেটা কখনো বড় কথা না। আজকের খেলাটা অন্যরকম কারণ এই খেলায় এমন একজন অংশ নিয়েছে সাধারণভাবে তার এখানে অংশ নেবার কথা নয়। সেটা সম্ভব হয়েছে একটা বিশেষ ধরনের বলের জন্যে। কাজেই যে বলটা তৈরি করেছে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। সেই বলের আবিষ্কারক ক্লাস এইটের তিতু।" ম্যাডাম বললেন, "তিতু তুমি কোথায়? এখানে চলে এসো।"

আমাদের ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে। আমি তার মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাডামের কাছে গেলাম। ম্যাডাম বললেন, "তোমরা সবাই এই ঝুনঝুন বলের আবিষ্কারক তিতুর জন্যে হাততালি দাও।" সবাই হাততালি দিতে থাকে। আমি দেখলাম দর্শকদের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই কমবয়সী মুচিও হাততালি দিচ্ছে। তারও খুব আনন্দ হচ্ছে বলে মনে হল।

আমি ফিসফিস করে ম্যাডামকে বললাম, "ম্যাডাম যে মানুষটা এই বলটা তৈরি করেছে সেও এখানে আছে।"

"তাই নাকি?"

"জি ম্যাডাম।"

"ভেরি গুড, তাকেও ডেকে নিয়ে আসি। নাম কী?"

"ম্যাডাম। সে কিন্তু মুচি।

"আমি জানি। তাতে কী আসে যায়? নাম কী?"

"নাম তো জানি না।"

ম্যাডাম তখন দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের তিতু এই বলের আবিষ্কারক, কিন্তু সেই আবিষ্কারকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন যিনি তিনিও আজকে এই মাঠে হাজির আছেন। তিনি নিজের হাতে এই বলটা তৈরি করেছেন, আমি তাকেও চলে আসতে অনুরোধ করছি।"

কমবয়সী মুচির মুখে প্রথমে অবিশ্বাস এবং তারপর ভয়ের ছায়া পড়ল। সে দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে থাকে সে কিছুতেই আসবে না। অন্যেরা তখন রীতিমতো জোর করে ঠেলে তাকে সামনে নিয়ে এল। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম কী?"

"নাম? আমার?"

"জি।"

"লালচান রাজবংশী।" আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম নামটা বলতে রাজি হয় নি, আজকে তাকে বলতে হল!

ম্যাডাম বললেন, "আমি আজকে জনাব লালচান রাজবংশীকে আমাদের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ টিমের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে অনুরোধ করছি।"

মানুষটি নিজের কানকে বিশ্বাস করল না, সে ম্যাডামকে ফিসফিস করে বলল, "কী করছেন ম্যাডাম? আমি একজন মুচি। জুতা সেলাই করি।"

ম্যাডাম বললেন, "আপনি লালচান রাজবংশী, ঝুনঝুন বল মেকার। পুরস্কার তুলে দেন।"

লালচান রাজবংশী পুরস্কার তুলে দিল, যারা খেলোয়ার তাদের গলায় ম্যাডেল পরিয়ে দিল। ঠিক কী কারণ জানা নেই আমি দেখলাম মানুষটি খুব সাবধানে তার চোখ মুছছে! ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলল আর যতগুলো ছবি

আমারবই.কম
amarboi.com

তোলা হল সবগুলোর ভিতরে আমি ঢুকে গেলাম, ম্যাডামের পাশে দাঁড়িয়ে আমি দাঁত বের করে হাসতে লাগলাম।

আঁখির গলায় যখন মেডেল পরিয়ে দেওয়া হল তখন প্রচণ্ড হাত তালিতে মাঠ ফেটে যাবার অবস্থা। সুজন হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, "সবার সেরা!"

আমরা বললাম, "আঁখি! আঁখি।"

আমরা বিশাল কাপটা নিয়ে স্কুলের মাঠে ঘুরতে থাকি। ছোট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। তারা চিৎকার করতে থাকে, "আমার আপু তোমার আপু—"

"আঁখি আপু! আঁখি আপু!!"

৮

যখন আঁখি তার আব্বুর কাছ থেকে ক্রিকেট টিমের জন্যে একটা অসাধারণ উপহার আদায় করল

প্রত্যেকবারই ছুটির আগে আমি ছুটিতে কী কী করব তার একটা লম্বা লিস্ট করি, কোনোবারই সেই লিস্টের কোনো কিছুই করা হয় না। স্কুলের ছুটি শেষ হবার আগে প্রত্যেকবারই আমার মন খুঁতখুঁত করতে থাকে যে ছুটিতে কিছুই করতে পারলাম না। এইবার তাই বুদ্ধি করে ছুটির জন্যে কোনো কাজই রাখি নি, ঠিক করে রেখেছি এই ছুটিতে আমি কিছুই করব না, তা হলে ছুটি শেষ হবার পর মন খুঁতখুঁত করবে না। ম্যাডাম অবশ্যি প্রত্যেক ক্লাসের ছেলেমেয়েদের একটা বইয়ের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন, সবাইকে বলে দিয়েছেন ছুটিতে এই বইগুলো পড়তে হবে। গল্প বই পড়া তো আর কাজ হতে পারে না তাই সেটা নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। লাইব্রেরি থেকে একজন একেকটা বই ইস্যু করে নিয়েছে। এখন ছুটির মাঝে আমরা নিজেরা নিজেরা বইগুলি নিজেদের ভিতরে বদলাবদলি করে নিচ্ছি। একদিন সুজনের সাথে বই বদল করতে গিয়েছি, গিয়ে দেখলাম সে মহা উত্তেজিত। আমাকে দেখে হাত পা নেড়ে বলল, "জানিস কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে?"

"আমরা যে ক্রিকেট খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম মনে আছে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "মনে থাকবে না কেন?"

"আঁখির আব্বু সে জন্যে খুব খুশি হয়েছেন। খুশি হয়ে আঁখিকে বলেছেন আঁখি যেটা চাইবে সেটাই পাবে!"

"কী মজা! আঁখি কী চেয়েছে?"

"কী চেয়েছে সেটা শুনলে তুই ট্যারা হয়ে যাবি।"

আমি বললাম, "আমি কেন ট্যারা হব?"

সুজন বলল, "তুই বল দেখি আঁখি কী চেয়েছে?"

আমি মাথা চুলকালাম। জন্মদিনে তার বাসায় গিয়ে আমি দেখেছি তারা অসম্ভব বড়লোক। একজন মানুষের যা যা দরকার তার সবই সেই বাসায় আছে। আঁখি বেচারি যেহেতু চোখে দেখতে পায় না তাই অনেক জিনিস সে ব্যবহার করতে পারবে না। আমি চিন্তা করে বললাম, "একটা হনুমানের বাচ্চা?"

সুজন আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "হনুমানের বাচ্চা?"

"হ্যাঁ। হনুমানের বাচ্চা। ঠিকমতো ট্রেনিং দিলে সেটা আঁখির জন্যে কাজ করতে পারবে। ধর আঁখির একটা কলম দরকার, আঁখি বলবে, "এই গুল্লু—"

"গুল্লু!"

"হ্যাঁ গুল্লু—হনুমানের নাম।"

সুজন কেমন জানি রেগে উঠল, বলল, "হনুমানের নাম গুল্লু?"

"কেন? হনুমানের নাম গুল্লু হতে পারে না?"

সুজন কেন জানি আরো রেগে উঠল, বলল, "তোর নাম হওয়া উচিত গুল্লু।"

এবারে আমিও রেগে উঠলাম, বললাম, "কেন আমার নাম কেন গুল্লু হবে?"

"কারণ, তোর বুদ্ধি হচ্ছে হনুমানের মতো?" সুজন হাত পা নেড়ে বলল, "আমি জিজ্ঞেস করলাম আঁখি তার আব্বুর কাছে কী চেয়েছে—আর তুই বলিস হনুমান!"

আমি রেগে বললাম, "হনুমানের বাচ্চা!"

"ঠিক আছে হনুমানের বাচ্চা! একজন মানুষ যদি নিজে হনুমান না হয় তা হলে সে হনুমানের বাচ্চার কথা বলতেই পারে না।"

আমার সাথে সুজনের একটা মারামারি লেগে যেত—কিন্তু ঠিক তখন সুজনের আম্মু আমাদের জন্যে নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তাই মারামারিটা লেগে গেল না, আমরা নাস্তা খেতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

নাস্তা খাওয়ার পর আমাদের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আঁখি কী চেয়েছে তার আব্বুর কাছে?"

"আঁখি তার আব্বুকে বলেছে আমাদের পুরা ক্রিকেট টিমকে কক্সবাজার রাঙামাটি বান্দরবান নিয়ে যেতে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ"

"তার আব্বু রাজি হয়েছে?"

"হবেন না কেন?" সুজন দাঁত বের করে হেসে বলল, "তার মানে আমি, বজলু, আশরাফ, মামুন, রিতু, শান্তা আর আঁখি কক্সবাজার রাঙামাটি আর বান্দরবান যাব। কী মজা!"

আমি চমকে উঠলাম, আমার নাম বলে নি! তখন মনে পড়ল সত্যিই তো আমি ক্রিকেট টিমে নাই—কিন্তু আমি যদি ঝুনঝুন বলটা আবিষ্কার না করতাম তা হলে কী আঁখি ক্রিকেট খেলতে পারত? তা হলে আমি কেন যেতে পারব না? কিন্তু আমাকে যদি নিতে না চায় তা হলে আমি কী করব?

সুজন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে হাসতে বলতে থাকে, "কী মজা হবে! আঁখির আব্বু সব ব্যবস্থা করে দিবে, আমরা এয়ারকন্ডিশান গাড়ি করে যাব, হাইফাই হোটেলে থাকব, হাম বার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ কাটলেট এইগুলি খাব, ঘুরে বেড়াব! চিন্তা করেই আমার ঘুম হচ্ছে না!"

আমি শুকনো মুখে বললাম, "আঁখি তোদের সবার সাথে কথা বলেছে?"

"এখনো বলে নাই। তারিখটা ঠিক হলেই বলবে!"

"তোদের বাসা থেকে পারমিশান দিবে?"

সুজন চোখ কপালে তুলে বলল, "দিবে না কেন?"

আমি বললাম, "না-মানে ইয়ে—" কথাটা শেষ না করেই আমাকে থেমে যেতে হল। সত্যিই তো এরকম চমৎকার একটা ব্যাপার সেখানে যেতে বাসা থেকে পারমিশান দেবে না কেন?

আমি বাসায় ফিরে আসলাম খুবই মন খারাপ করে। আমি ইচ্ছে করলেই ক্রিকেট টিমে থাকতে পারতাম—মামুন আর আশরাফের থেকে আমি মোটেও খারাপ খেলি না কিন্তু তাদের অনেক বেশি আগ্রহ ছিল দেখে আমি তাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন সেজন্যে আমি পড়ে থাকব আর তারা রাঙামাটি, বান্দরবান আর কক্সবাজার বেড়াতে যাবে? পৃথিবীতে এর থেকে বড় অবিচার আর কী হতে পারে?

পরের কয়েকদিন আমি ছাড়া ছাড়া ভাবে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে নানা রকম খবর পেতে থাকি। সুজন যেটা বলেছে সেটা সত্যি। ক্রিকেট টিমের

আমারবই.কম
amarboi.com

সবাইকে আঁখির আব্বু এক সপ্তাহের জন্যে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান আর কক্সবাজার নিয়ে যাচ্ছেন। কীভাবে কী করা হবে সেটা ঠিকঠাক করার জন্যে পরশুদিন সবাই আঁখিদের বাসায় যাবে কথাবার্তা বলবে। সবার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে—আমাকে কেউ কিছু বলে নি। যার অর্থ আমাকে ছাড়াই যাওয়া হবে। আমি ভাবলাম লজ্জার মাথা খেয়ে আমি আঁখিদের বাসায় গিয়ে আঁখির আব্বুকে বলি, "প্লিজ প্লিজ, আমাকে নিয়ে যান! আমি হয়তো ক্রিকেট টিমে নাই, কিন্তু আমি যদি ঝুনঝুন বলটা তৈরি করে না দিতাম তা হলে আঁখি ক্রিকেট খেলতে পারত না।" কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর সেটা করা যায় না! পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার খুব অভিমানও হল—আমি না হলে কিছুই হত না—অথচ আমাকে ছাড়াই সবাই আনন্দ করতে যাচ্ছে। অন্য সবার কথা ছেড়ে দিলাম, আঁখি কি তার আব্বুকে একবারও বলতে পারে না যে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক?

আমি হিসেব করে বের করলাম কখন আঁখিদের বাসায় সবাই যাচ্ছে, সেই সময়টা আমি টেলিফোনের কাছাকাছি থাকলাম। মনে মনে আশা করতে লাগলাম হঠাৎ করে টেলিফোন বেজে উঠবে আর আঁখি ফোন করে বলবে, "তিতু তুই চলে আয়! তোকেও আমরা নিয়ে যাব।"

কিন্তু টেলিফোন বাজল না। রাতে সুজন ফোন করে বকবক করতে লাগল, "বুঝলি তিতু, আমরা রওনা দিব খুব ভোরে। সকালে নাস্তা করা হবে রেস্ট এরিয়াতে। ডিম পরোটা আর সবজি। সাথে গরম চা। দুপুরের খাওয়া হবে চিটাগাংয়ে। গাড়িতে সবরকম খাবার থাকবে। পনেরোজনের বিশাল গাড়ি। ড্রাইভারের পাশে বসবে জাবেদ আঙ্কেল। আমরা পিছনে। জাবেদ আঙ্কেল হচ্ছে আঁখির আব্বুর ডান হাত, সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেবে। জাবেদ আঙ্কেল ছাড়াও যাবে নিশাত আপু। নিশাত আপু হচ্ছে আঁখির কাজিন। মেডিকেলে পড়ে—হাফ ডাক্তার, আমাদের দেখে শুনে রাখবে। চিটাগাংয়ে একটা রেস্ট হাউজে আমরা লাঞ্চ করব—তারপর আবার রওনা। প্রথমে রাঙ্গামাটি নাকি প্রথমে বান্দরবান সেটা নিয়ে বিশাল আলোচনা হল, শেষে ভোটাভুটি। আমি বান্দরবান ভোট দিয়েছিলাম, ভোটে বান্দরবান জিতে গেল। হা হা হা!..." সুজন টানা কথা বলে যেতে থাকে আমি শেষের দিকে কিছু শুনছিলাম না, আমার চোখে শুধু পানি এসে যেতে থাকে।

খাবার টেবিলে আমি কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেলাম, ভাইয়া বকবক করে গেল। আম্মু একসময় জিজ্ঞেস করলেন, "তিতু তুই এতো চুপচাপ তোর শরীর খারাপ নাকি?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না শরীর খারাপ না।"

ফুলি খালা বলল, "তিতুর কিছু একটা হয়েছে। কয়দিন থেকে চুপচাপ, খালি কী যেন চিন্তা করে।"

আম্মু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তিতু। বল আমাদের।"

আমি বললাম, "কিছু হয় নি।" তারপর অনেক কষ্টে চোখের পানি লুকালাম। আমার মন খারাপ দেখে ভাইয়ার খুব আনন্দ হচ্ছে মনে হল, আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায় আর খ্যাক খ্যাক করে হাসে।

খাওয়া শেষ করে আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়েছি। চোখে ঘুম আসছে না, প্রচণ্ড অভিমানে আমার বুকটা প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল আঁখি অন্তত একবার ফোন করে আমার সাথে কথা বলতে পারত।

ঠিক এরকম সময় ফোন বাজল, ফোন ধরল ফুলি খালা। তারপর আমার বিছানার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তিতু, তুমি জাগা না ঘুম।"

আমি উঠে বসলাম, "কেন?"

"তোমার ফোন?"

"কে?"

"একটা মেয়ে। নাম আঁখি।"

আমি একবার ভাবলাম বলি, গিয়ে বলে দাও ঘুমিয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত বললাম না, গিয়ে ফোন ধরলাম, "হ্যালো।"

অন্যপাশ থেকে আঁখি বলল, "তিতু।"

"হ্যাঁ।"

আঁখি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বুঝলি তিতু, যতবার চিন্তা করছি তুই যেতে পারবি না আমার মনটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করি—তুই তোর গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে এলে তারপরে যাই—"

আমি বললাম, "গ্রামের বাড়ি? কিসের গ্রামের বাড়ি?"

আঁখি বলল, "তুই যে তোর ফেমিলির সাথে গ্রামের বাড়ি যাবি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি গ্রামের বাড়ি যাব?"

"হ্যাঁ। আমার আব্বু সেই যে ফোন করল, তোর ভাইয়ের সাথে কথা বলল। তোর ভাই বলল তোরা গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিস। তুই যেতে পারবি না—"

আমারবই.কম amarboi.com

আমার মাথার মাঝে চন্‌ন্‌ন্‌ করে রক্ত উঠে গেল। তার মানে ভাইয়া আঁখির আব্বুর সাথে মিথ্যা কথা বলেছে যেন আমি যেতে না পারি। আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "আমরা কোথাও যাচ্ছি না। আমরা এখানেই আছি।"

"তার মানে তুই যেতে পারবি?" আঁখি চিৎকার করে বলল, "আমাদের সাথে যেতে পারবি?"

"আব্বু আম্মু যদি রাজি হন—"

"সেটা আমাদের উপর ছেড়ে দে।" আমি শুনলাম আঁখি "ইয়াহু" বলে একটা চিৎকার করল। তারপর চিৎকার করে তার আব্বুকে ডাকতে লাগল। আমি শুনতে পেলাম আঁখি উত্তেজিত গলায় তার আব্বুর সাথে কথা বলছে, কিছুক্ষণ পর আঁখির আব্বু ফোন ধরলেন, "হ্যালো তিতু?"

"জি চাচা।"

"তোমার আব্বু আম্মু কি জেগে আছেন?"

"জি চাচা জেগে আছেন?"

"একটু কি কথা বলা যাবে—যে কোনো একজনের সাথে?"

আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, "যাবে চাচা। যাবে। আপনি একটু ধরেন।"

আমি প্রায় ছুটে গেলাম আব্বুর কাছে, যাবার সময় দেখলাম, ভাইয়া পড়ার টেবিলে বইয়ের উপর ঝুঁকে বসে পড়ার ভান করছে, কিন্তু তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে আসলে টেলিফোনে আমার প্রত্যেকটা কথা খুব মন দিয়ে শুনছে। তার চেহারার মাঝে একটা চোর চোর ভাব।

আব্বু এসে ফোন ধরলেন, আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আব্বু একটু কথা শুনেই বললেন, "না, না—আপনার কষ্ট করে আসতে হবে না, ফোনেই বলতে পারেন।"

আঁখির আব্বু মনে হল জোর করলেন, বাসায় এসে কথা বলতে চান। আব্বু তখন আর না করলেন না। আম্মুকে ডেকে বললেন, "তিতুর ক্লাসে আঁখি নামের যে মেয়েটা পড়ে তার আব্বু আসছেন।"

"এতো রাতে কেন?"

"ক্লাসের কয়েকজনকে নিয়ে চিটাগাং হিলট্র্যাকে বেড়াতে যাবে, তাই তিতুকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। আমাদের পারমিশানের জন্যে।"

"পারমিশানের কী আছে?" আম্মু বললেন, "সবাই মিলে বেড়াতে যাবে, ভালোই তো।"

আব্বু বললেন, "ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস টাইপের। বললেন আপনার ছেলেকে নিয়ে যাব, পুরো ব্যবস্থাটা শুনেন যেন আপনাদের মনে কোনোরকম দুশ্চিন্তা না থাকে।"

"তাই বলে এতো রাতে?"

আব্বু ইতস্তত করে বললেন, "আমি ঠিক বুঝলাম না, বললেন কী যেন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, কেন জানি মনে করেছিলেন আমরা গ্রামের বাড়ি যাব তিতুকে নিয়ে। সেই জন্যে আমাদের বলা হয় নি—অন্য সবাই রেডি। তিতু নাকি কী একটা কল তৈরি করে দিয়েছে তার মেয়েকে, সেই বল দিয়ে মেয়ে নাকি ক্রিকেট পর্যন্ত খেলতে পারে! তাই তিতু ছাড়া যাবে সেটা নাকি চিন্তাই করতে পারছেন না।"

আম্মু বললেন, "কিন্তু আমরা গ্রামের বাড়ি যাব সেই কথাটা কেন আসছে—"

আমি বলতে গেলাম, "ভাইয়া—" কিন্তু বললাম না, থেমে গেলাম। পুরো ব্যাপারটা মিটে যাক তারপর দেখা যাবে।

আঁখির আব্বু আর আম্মু দুজনেই চলে এলেন, আব্বু আর আম্মুর সাথে কথা বললেন, এমনভাবে কথা বললেন যে মনে হল আমি বুঝি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আর আমাকে যেতে দিয়ে আমার আব্বু আম্মু আঁখির আব্বু আম্মুকে কৃতার্থ করে দিলেন। কাজের কথা শেষ হবার পর অন্য গল্পগুজব হল, তারা আঁখিকে নিয়ে কথা বললেন, আগে কেমন মন খারাপ করে থাকত, আমাদের স্কুলে আসার পর কেমন হাসিখুশি থাকে এই রকম গল্প।

রাত্রে ঘুমানোর সময় যখন আশেপাশে কেউ নেই তখন আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাইয়া তুমি আঁখির আব্বুকে মিথ্যা কথা কেন বলেছিলে?"

ভাইয়া আমতা আমতা করে বলল, "আ-আ-আমি আসলে আসলে—" কথা শেষ না করে ভাইয়া থেমে যায়। আমার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, "প্লিজ তিতু তুই আব্বু আম্মুকে বলিস না। প্লিজ প্লিজ—আমি আর কোনোদিন করব না। খোদার কসম—"

আমি অবাক হয়ে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সারাটা জীবন ভাইয়া আমাকে জ্বালিয়ে গেছে, হঠাৎ করে আমি আবিষ্কার করলাম ভাইয়া আসলে খুবই

আমারবই.কম amarboi.com

দুর্বল অপদার্থ, ফালতু একজন মানুষ। তার উপর রাগ করে লাভ নেই, তার জন্যে বরং মায়া হতে পারে। আমার তখন হঠাৎ করে এই দুর্বল হতভাগা ভাইটার জন্যে এক ধরনের মায়া হল। আহা বেচারা!

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই আমি আমার ক্লাসের সবার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম, তখন সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার সাথে কেউ যোগাযোগ করছিল না কারণ সবাই বুঝতে পেরেছিল আমি যেতে পারব না বলে নিশ্চয়ই আমার খুব মন খারাপ, এখন যদি অন্যেরা সেটা নিয়ে কথা বলে তা হলে আমার আরো মন খারাপ হবে। যে জিনিসটা কেউ ঠিক করে বুঝতে পারছিল না সেটা হচ্ছে আমাদের যদি আসলে গ্রামের বাড়ি যাবার কথা না থাকে তা হলে কেন ভাইয়া সেটা বলল। ভাইয়া চায় না আমি যাই সে জন্যে এতো বড় মিথ্যা কথাটা বলেছে সেটা বলতে আমার লজ্জা হল তাই আমি আরেকটা ছোট মিথ্যা কথা বললাম। আমি তাদের বললাম, "এই ধরনের একটা আলোচনা হচ্ছিল ভাইয়া তারিখটা তুলে গোলমাল করে ফেলেছে।"

তবে ভাইয়া আমাকে নিয়ে যে মিথ্যা কথাটা বলেছে বজলুর জন্যে সেটা সত্যি বের হয়ে গেল। বজলুর নানা খুব অসুস্থ, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবেন তাই বজলুর বাসার সবাই তার নানাকে শেষ দেখার জন্যে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে। বজলুকেও যেতে হবে। তার মানে সে আমাদের সাথে যেতে পারবে না। বজলুর সাথে কথা বলে বোঝা গেল মারা যাবার জন্যে এরকম একটা সময় বেছে নেবার জন্যে বজলু কোনোদিন তার নানাকে ক্ষমা করবে না।

বজলুর মতোই ফাটা কপাল বের হল আশরাফের। ঠিক এই সময়টাতে তার বোনের বিয়ে। তার উপর যদি ছেড়ে দেয়া হত তা হলে সে নিঃসন্দেহে বোনের বিয়েতে হাজির না থেকে আমাদের সাথে রাঙামাটি, বান্দরবান আর কক্সবাজার যেত। কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় না, বড়রা ঠিক করে, তাই আশরাফেরও যাওয়া হল না। দেখা গেল সব মিলিয়ে যাব আমরা ছয়জন, ছেলেদের মাঝে আমি, সুজন আর মামুন। মেয়েদের মাঝে রিতু, শান্তা আর আঁখি। আঁখির আব্বু খুবই গোছানো মানুষ, কবে কোথায় যাওয়া হবে, কোথায় থাকা হবে, সাথে কী নিতে হবে—সবকিছু কাগজে টাইপ করে লিখে দিয়েছেন। অন্যেরা আগেই সেই লিস্ট পেয়ে গেছে, সাথে যা যা নেওয়ার কথা

সেগুলো জোগার করে তারা রেডি হয়ে গেছে। আমি শেষ মুহূর্তে পেয়েছি কিন্তু সেজন্যে আমার সেরকম কোনো সমস্যা হয় নি। লিস্টটি খুবই সহজ, নিজের জামা কাপড় ছাড়া তেমন কিছু নেই। বাকি যা কিছু লাগবে সবকিছু আমাদের জন্যে ম্যানেজ করে নেয়া হবে।

আমি অবশ্যি নিজে খুঁজে খুঁজে কিছু জিনিস নিয়ে নিলাম। ছবি তোলার জন্যে আব্বুর ক্যামেরা, পড়ার জন্যে গল্পের বই, রোদ থেকে বাঁচার জন্যে বেস বল ক্যাপ, চোখে দেওয়ার জন্যে কালো চশমা, ছবি আঁকার জন্যে রং তুলি, লেখালেখি করার জন্যে কাগজ কলম, ভ্রমণের কাহিনী লেখার জন্যে ডাইরি, ছোটখাটো কাটাকুটি করার জন্যে ছোট চাকু, পেট খারাপ হলে খাবার জন্যে খাবার স্যালাইন, জ্বর সর্দি কাশির জন্যে প্যারাসিটামল, দাঁত ব্রাশ করার জন্যে টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, চুল আঁচড়ানোর জন্যে চিরুনি।

যেদিন রওনা দেব তার আগের রাতে আমার চোখে ঘুমই আসতে চায় না! শেষ পর্যন্ত যখন ঘুমিয়েছি তখন ঘুমটা হল ছাড়া ছাড়া, সারা রাত স্বপ্ন দেখলাম গাড়ি করে যাচ্ছি আর গাড়িটা থেমে যাচ্ছে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সকলে মিলে!

আমারবই.কম amarboi.com

৯

যখন আমরা আঁখিকে শিখিয়ে দিলাম কেমন করে একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করতে হয়

খুব ভোরে আম্মু আমাকে ডেকে তুললেন। অন্য যে কোনো দিন হলে আমি অনেক ধরনের গাঁইগুঁই করতাম, "আর পাঁচ মিনিট" "আর এক মিনিট" বলে বিছানায় ঝাপটি মেরে পড়ে থাকতাম, আজকে তার কিছুই করলাম না। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে গেলাম, দাঁত ব্রাশ করে গোসল করে রেডি হয়ে গেলাম। ফুলি খালা রুটি টোস্ট আর ডিম পোচ করে দিলেন। অন্য যে কোনো দিন হলে খাওয়া নিয়ে কম পক্ষে আধা ঘণ্টা ঘ্যানঘ্যান করতাম, আজকে কিছুই করলাম না, গপগপ করে খেয়ে ফেললাম।

কিছুক্ষণের মাঝে বাসার সামনে একটা গাড়ি এসে হর্ন দিল, আমি সাথে সাথে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেলাম। ভাইয়া ঘুমিয়ে থাকল না হয় ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। আম্মু ঘুম ঘুম চোখে বাইরে এসে বললেন, "সাবধানে থাকিস।"

আম্মু আমার সাথে গাড়ি পর্যন্ত এলেন, গাড়ির দরজা খোলা ভেতরে সবাই বসে আছে। আমার ব্যাগটা পিছনে রাখা হল, আমি সামনের সিটে বসলাম। আম্মু বললেন, "সাবধানে থাকিস। দুষ্টুমি করিস না।"

আমি বললাম, "করব না আম্মু।"

আম্মু তখন আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "ফি আমানিল্লাহ্।"

তখন অন্য সবাই তাদের মাথা এগিয়ে দিয়ে বলল, "চাচি আমাকে! চাচি আমাকে।"

আম্মু তখন সবার মাথায় হাত রেখে বললেন, "ফি আমানিল্লাহ্।" তারপর দরজা বন্ধ করা হল, ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। অন্য সবাইকে আগেই তুলে নেয়া হয়েছে, আমি শেষ জন। আমাকে তুলে নেবার পর গাড়ি সত্যি সত্যি চিটাগাংয়ের রাস্তায় রওনা দিল।

আমি ভালো করে ভেতরে তাকালাম, ড্রাইভারের পাশে বসেছেন আঁখির আব্বুর ডান হাত জাবেদ চাচা। পিছনে বসেছেন নিশাত আপু। আমরা ছয়জন মাঝখানে। জাবেদ চাচা কাজের মানুষ, কাজের মানুষেরা মনে হয় কথা কম বলে। তাই জাবেদ চাচা মুখে তালা মেরে বসে থাকলেন। নিশাত আপু মোটাসোটা নাদুসনুদুস একজন মেয়ে। যারা মোটাসোটা নাদুসনুদুস হয় তারা সাধারণত হাসিখুশি হয়, নিশাত আপুও হাসিখুশি। আমরা ছয়জন ভ্রমণের উত্তেজনায় এত হইচই করছিলাম যে নিশাত আপু আমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। যারা মোটাসোটা নাদুসনুদুস তাদের মনে হয় ঘুম অন্যদের থেকে বেশি। একটু পর দেখলাম গাড়ির সিটে মাথা রেখে মুখে মিটিমিটি হাসিসহ নিশাত আপু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

গাড়ি ছাড়তেই সুজন বলল, "আমি কিন্তু জানালার পাশে বসব।"

রিতু বলল, "ঠিক আছে। তোর ইচ্ছে করলে তুই গাড়ির ছাদেও বসতে পারিস।"

আঁখি বলল, "উঁহু। কেউ গাড়ির ছাদে বসে যেতে পারবে না। সেফটি ফার্স্ট।"

আমি বললাম, "খামোখা চেষ্টা করে লাভ নেই। সুজনকে যতই বোঝানোর চেষ্টা কর সে কোনো একটা ঝামেলা করবেই।"

মামুন বলল, "সুজন যদি বেশি দুষ্টুমি করে আমরা ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব।"

শান্তা বলল, "আমরা তখন গাড়ি করে যাব আর সুজন গাড়ির পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে আমরা সবাই হি হি করে হাসতে থাকি। সুজন হাসল সবচেয়ে জোরে জোরে। আঁখি হাসতে হাসতে বলল, "উঁহু। কাউকে গাড়ি থেকে নামানো যাবে না। সেফটি ফার্স্ট।"

রিতু বলল, "সুজনকে নামিয়ে দিলেই গাড়ির সেফটি বেশি হবে। তুই কী বেশি সেফটি চাস নাকি কম সেফটি চাস?"

আমারবই.কম amarboi.com

আঁখি বলল, "আমরা সুজনকেও চাই, সেফটিও চাই!"

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমাদের গাড়ি এগুতে থাকে। আমরা এতো ভোরে রওনা দিয়েছি—এখনো চারিদিকে ঠিকমতো আলো হয় নি, কিন্তু তার মাঝেই লোকজন কাজকর্ম শুরু করেছে। চায়ের দোকানগুলো খুলছে, চুলোয় আগুন দিচ্ছে। মাথায় বোঝা নিয়ে মানুষজন যাচ্ছে। রাস্তার পাশে হকাররা খবরের কাগজ ভাগাভাগি করছে, রিকশা নিয়ে রিকশাওয়ালারা বের হয়েছে। এক কথায় দেখেই বোঝা যায় শহরটা জেগে উঠছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আঁখি এর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু যে দেখতে পাচ্ছে না তা নয় কখনোই দেখতে পাবে না। দেখতে না পেলে কেমন লাগে বোঝার জন্যে মাঝে মাঝে আমি চোখ বন্ধ করে থাকি কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরে আমি ছটফট করতে থাকি, আমাকে চোখ খুলে ফেলতে হয়। আঁখি দিনের পর দিন এভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে চিন্তা করে হঠাৎ আমার ওর জন্যে অন্য এক রকম মায়া হতে থাকে। আমি জানি আঁখি সবকিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু কেউ ওর জন্যে মায়া করলে সেটা সহ্য করতে পারে না, সে চায় সবাই তাকে অন্য সবার মতন দেখুক। আমরা সবাই সেটা বুঝে ফেলেছি তাই তাকে সব সময় অন্য সবার মতন দেখি, কখনোই আলাদা করে দেখি না। অন্তত সেরকম ভান করি।

রাস্তার একপাশ থেকে হঠাৎ একজন মানুষ দৌড় দিয়ে রাস্তা পার হল, ড্রাইভারকে এক মুহূর্তের জন্যে গাড়িকে ব্রেক কষে মানুষটাকে বাঁচাতে হল, আমরা সবাই একটা ঝাঁকুনি টের পেলাম, আঁখি বলল, "কী হল?"

আমি বললাম, "একটা ছাগল রাস্তা পার হতে চেষ্টা করেছে।"

মামুন বলল, "ছাগল না। মানুষ।"

আমি বললাম, "যে মানুষ এভাবে গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয় সে মোটেও মানুষ না। সে আসলে ছাগল।"

ঠিক তখন সত্যি সত্যি একটা ছাগল হেলতে দুলতে রাস্তার মাঝখানে চলে এল, ড্রাইভারকে আবার ব্রেক কষে পাশ দিয়ে যেতে হল, আবার আমরা সবাই একটা ঝাঁকুনি টের পেলাম। আঁখি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হল!"

আমরা তার কথার উত্তর না দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগলাম। আঁখি বলল, "কী হল? হাসিস কেন?"

"আবার একটা ছাগল রাস্তা পার হতে চেষ্টা করছে।"

"এর মাঝে হাসির কী হল?"

মামুন বলল, "এটা সত্যিকারের ছাগল, সেটা চার পায়ে হাঁটে।"

আমরা তখন মাঝে মাঝে আঁখিকে ধারা বর্ণনা দিতে থাকি। যেমন আমি বললাম, "আমাদের পাশ দিয়ে একটা বাস যাচ্ছে। বাসের পিছনের জানালা দিয়ে মাথা বের করে একজন টিশটাশ মহিলা হড়হড় করে বমি করছে।"

রিতু বলল, "ছিঃ তিতু! তোর এগুলো বলার দরকার কী?"

"যা দেখছি সেটাই বলছি। চোখ আছে বলে খালি আমাদের এই সব দৃশ্য দেখতে হবে, আঁখিকে দেখতে হবে না সেটা হতে পারে না।"

আঁখি হি হি করে হেসে বলল, "দে, দে, ওকে বলতে দে।"

উৎসাহ পেয়ে আমি বললাম, "আমরা এখন শহর থেকে বের হয়েছি। রাস্তার দুই পাশে ধান খেত, খাল, গাছপালা এগুলো দেখা যাচ্ছে। একজন মানুষ তার গেঞ্জিটা ওপরে তুলে ভুঁড়িটা বের করে সেটা চুলকাতে চুলকাতে দাঁত ব্রাশ করছে। কেন একই সাথে ভুঁড়ি চুলকাতে হবে আর দাঁত ব্রাশ করতে হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। দাঁত ব্রাশ করা খুবই জরুরি কাজ কিন্তু কেন সেটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে করতে হবে সেটাও আমি জানি না।"

একটু পরে বললাম, "একজন মানুষ বদনা নিয়ে ছুটছে। এই যে সে মাঠের পাশে বসে গেল। সে এখন কী করছে সেটা বলতে চাই না—"

শান্তা আর রিতু গুম গুম করে আমার পিঠে কিল দিয়ে বলল, "অসভ্য অসভ্য!"

একটু পরেই এই ধারাবর্ণনা দেওয়াটা আমাদের মাঝে একটা খেলার মতো হয়ে গেল। সবচেয়ে সুন্দর করে দিতে পারে রিতু, সে বলে, "আমাদের রাস্তাটা এখন ডান দিকে একটু বেঁকে গেল, সূর্যটা বাম দিকে সরে এসেছে। সূর্যটা এখনো কমলা রংয়ের, মনে হয় বিশাল মসুরের ডাল। সামনে থেকে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক আসছে, এই যে, হুঁশ করে পাশ দিয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছে সামনে একটা নদী। নদীতে পানি টইটম্বুর, এতো সকালেও একটা নৌকা হেলতে দুলতে যাচ্ছে। নদীর দুই ধারে সবুজ ধান খেত। সবুজ রংয়ের মাঝে যে এতো রকম শেড থাকতে পারে কে জানতো। কোনো কোনো ধান খেত হালকা সবুজ কোনোটা গাঢ়। টুকটুকে লাল রংয়ের ফ্রক পরা ছোট একটা মেয়ে কালো রংয়ের বিশাল একটা ষাঁড়কে নিয়ে যাচ্ছে। ষাঁড়টার শিংগুলো ভয়ংকর, মনে হয় চলন্ত ট্রাককে গেঁথে ফেলবে, কিন্তু এই ছোট মেয়েটার কোনো ভয়ডর

আমারবই.কম

নেই। সে বিশাল ষাঁড়টাকে নিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাজে রকমের একটা বাস আমাদের ওভারটেক করতে চাচ্ছে, শুধু হর্ন দিয়ে যাচ্ছে। সামনে দিয়ে আরো গাড়ি আসছে এখন ওভারটেক করা যাবে না কিন্তু বেয়াদপ বাসটা ওভারটেক করে ফেলছে, কী ভয়ংকর! আমাদের ড্রাইভার চাচা অবশ্যি খুবই সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছেন। এই যে এখন আমরা ছোট বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, বাজারে অনেক রকম সবজি। এখনো বাজার শুরু হয় নি সবাই আসছে চারিদিক দিয়ে। বাজারের কাছে একটা বাসস্ট্যান্ড, সেখানে লাল শাড়ি পরা একটা বউ! ইশ, কী সুন্দর বউ! একেবারে সিনেমার নায়িকার মতো। এতো সুন্দর বউটার হাজব্যান্ডটা একটু ভ্যাবলা ধরনের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান চুলকাচ্ছে..."

রিতু যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ বলে যেতে পারে। আমাদের মাঝে সবচেয়ে খারাপ ধারা বর্ণনা দেয় সুজন। সে বলে, "এ্যাঁ ইয়ে আমরা এখন সামনে যাচ্ছি। হ্যাঁ সামনে যাচ্ছি। একটা সিএনজি ওভারটেক করলাম। এ্যাঁ—এখন যাচ্ছি। সামনে যাচ্ছি। আরেকটা সিএনজি ওভারটেক করলাম। এ্যাঁ এ্যাঁ যাচ্ছি। দূরে আরেকটা সিএনজি সেটাকেও ওভারটেক করব। এ্যাঁ ওভারটেক করলাম। এখন সামনে যাচ্ছি। এ্যাঁ সামনে যাচ্ছি!..."

ঘণ্টা দুয়েক পরে হঠাৎ জাবেদ চাচা ড্রাইভারকে বললেন, "রতন, গাড়ি থামাও।"

"এখানে?"

"হ্যাঁ। সামনে রেস্ট এরিয়া। সবাই একটু রেস্ট নিবে, চা নাস্তা খাবে।"

রতন ড্রাইভার বলল, "এক্ষুনি?"

জাবেদ চাচা বললেন, "হ্যাঁ। স্যার বলে দিয়েছেন প্রতি দুই ঘণ্টা পরে থামতে হবে, একটু রেস্ট নিতে হবে। তোমার চা খেতে হবে।"

"আমার লাগবে না স্যার, আরো এক দেড়শ কিলোমিটার যেতে পারব।"

"না না।" জাবেদ চাচা মাথা নাড়লেন, "এই বাচ্চাকাচ্চার দায়িত্ব আমার। তুমি একটু পরে পরে থামতে থামতে যাবে। আমি কোনো রিস্ক নিব না।"

কাজেই ড্রাইভার একটা রেস্ট এরিয়াতে থামল। পিছনে নিশাত আপু একেবারে কাদার মতো ঘুমাচ্ছিলেন, গাড়ি থামতেই আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠলেন। বললেন, "কোথায় থেমেছি? রেস্ট এরিয়াতে?"

আমরা মাথা নাড়লাম। নিশাত আপু হাসি হাসি মুখে বললে, "গুড! সবাই নাম। একটু হাত পা ছড়িয়ে নেয়া যাক। বাথরুম ব্রেকফাস্ট সব সেরে ফেলা যাক।"

আঁখি নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল, "আশেপাশে কী অনেক মানুষ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ একটা বাস থেকে নামছে।"

আঁখি একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে?"

"অনেকেই।"

"আমাকে দেখে আহা উহু করছে?"

"এখনো করছে না। এখনো বুঝতে পারছে না।"

আঁখি বলল, "যা বিরক্ত লাগে আমার! হোয়াইট কেনটা খুলতেই সবাই বুঝে যাবে আর আহা উহু শুরু করবে।"

আঁখির কথা সত্যি, সে যেই মুহূর্তে তার ভাঁজ করা সাদা লাঠিটা খুলে হাতে নিয়েছে সাথে সাথে সবাই মাথা ঘুরিয়ে আঁখির দিকে তাকাল। আমরা দেখলাম চাপা গলায় আঁখিকে নিয়ে কথা বলছে। আমরা যখন ভেতরে গিয়ে বসেছি তখন বোকা ধরনের একজন বয়স্কা মহিলা হেঁটে আমাদের কাছে এসে বলল, "এই মেয়ে চোখে দেখে না? অন্ধ?"

আমাদের ইচ্ছে হল মহিলাটার টুঁটি চেপে ধরি, কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর কারো টুঁটি চেপে ধরা যায় না তাই দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "না, দেখতে পায় না।"

"আহারে! কী কষ্ট।"

আমরা কিছু বললাম না।

"তোমাদের কী হয়?"

"বন্ধু।"

বন্ধু শুনে মহিলাটা কেমন জানি বিরক্ত হল, কেন বিরক্ত হল বুঝতে পারলাম না। বলল, "বাবা কী করে?"

আঁখির বাবা কী করে আমি ভালো করে জানি না, কিছু একটা উত্তর দিতে হয় তাই বললাম, "র‍্যাব। মাঝে মাঝে ক্রস ফায়ার করে।"

"ও আচ্ছা। র‍্যাব!" মহিলা একটু ঘাবড়ে গেল তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে আঁখির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "মা, তুমি এই জিন্দেগিতে কিছু না

আমারবই.কম amarboi.com

পেলে কী হবে, আখেরাতে তুমি সব পাবে! অন্ধ মানুষের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করে।"

মহিলা চলে যাবার পর আঁখি বলল, "মিথ্যা কথা।"

"কী মিথ্যা কথা?"

"অন্ধ মানুষের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করে।"

"কেন?"

"আমি দোয়া করেছিলাম এই মহিলার মাথায় যেন ঠাঠা পড়ে। পড়ে নাই।"

আমরা হি হি করে হাসতে লাগলাম, রিতু বলল, "আরে গাধা এইটা তো বদ দোয়া! বদ দোয়া কবুল করে কেউ তো বলে নাই।"

আমাদের টেবিলে নানারকম খাবার দিয়ে যায়। সকালে খেয়ে বের হয়েছি তারপরেও বেশ খিদে লাগছে। আমরা বেশ উৎসাহ নিয়ে খেতে শুরু করলাম, শুধু আঁখি পানির বোতল থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে বলল, "বুবলি, এই জন্যে আমি বাসা থেকে বের হতে চাই না।"

কী বলতে চাইছে সেটা আমরা ঠিকই বুঝতে পারছিলাম তারপরেও রিতু জিজ্ঞেস করল, "কী জন্যে?"

"এই যে আমাকে দেখেই আহা উহু শুরু করে দেয়! আমার এত বিরক্ত লাগে কী বলব। আমার কী ইচ্ছে করে জানিস?"

"কী?"

"আমি এমনভাবে বের হব যে কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারবে না যে আমি দেখতে পাই না, আর আমাকে দেখে আহা উহু করবে না।"

আমি বললাম, "সেটা আর কঠিন কী? তুই তোর লাঠিটা ব্যবহার করিস না তা হলেই কেউ বুঝতে পারবে না।"

"হ্যাঁ! আর হাঁটতে গিয়ে বাদুড়ের মতো এখানে সেখানে ধাক্কা ধুক্কা খাই!"

"খাবি না। আমরা তোর কাছে থাকব। তোকে সবকিছু বলে দেব। দেখ চেষ্টা করে।"

আঁখি কয়েক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করল তারপর বলল, "ঠিক আছে। দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু মনে রাখিস আমি যদি আছাড় খেয়ে পড়ে দাঁত ভাঙি তা হলে কিন্তু তোরা দায়ী থাকবি।"

আমি বললাম, "আছাড় খাবি না। আমরা কাছাকাছি থাকব তোকে পড়তে দিব না।"

আমরা যখন আবার গাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলাম তখন আঁখি তার ভাঁজ করা লাঠিটা খুলল না। সেটা হাতে নিয়ে হেঁটে যাওয়া শুরু করল। রিতু তার একটু সামনে, আমি তার একটু পিছনে। আমি ফিসফিস করে তাকে বলে দিতে লাগলাম, "সামনে দরজা। তারপর সিঁড়ি। তিনটা সিঁড়ি এক দুই তিন। সোজা সামনে, ডান দিকে মানুষ, বাম দিকে সরে যা।"

সামনে একটা বাস থেমেছে, সেখান থেকে মানুষজন নামছে, তারা আমাদের দিকে একনজর তাকাল কিন্তু কেউ আগের মতো ঘুরে তাকাল না! রিতু বলল, "খুব ভালো হচ্ছে আঁখি, কেউ তোকে সন্দেহ করছে না। শুধু একটা জিনিস তোর ঠিক করতে হবে।"

"কী জিনিস?"

"তুই সব সময় এক দিকে তাকিয়ে থাকিস। তোকে এদিক সেদিক তাকাতে হবে। সব মানুষ খামোখা এদিক সেদিক তাকায়। যখন কারো সাথে কথা বলবি তখন তার দিকে তাকাবি।"

আঁখি বলল, "ঠিক আছে।"

আমরা আঁখিকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে গাড়িতে এসে উঠলাম, কেউ একবারও আঁখির দিকে ঘুরে তাকাল না।

সবাইকে নিয়ে আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। আবার আমরা আঁখির জন্যে ধারা বিবরণী দিতে লাগলাম। দুই ঘণ্টা পর আবার গাড়ি থামল তখন আবার আঁখি স্বাভাবিক মানুষের মতো নেমে এল, আমরা সাবধানে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম, কেউ তার দিকে ঘুরে তাকাল না, কেউ আহা উহু করল না!

আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছলাম দুপুর বেলা। একটা গেস্ট হাউসে বলে রাখা ছিল, আমরা সেখানে গিয়ে উঠেছি। দুপুরে খাওয়ার জন্যে নানা রকম আয়োজন। সারা রাস্তা আমরা খেতে খেতে এসেছি, পেটে খিদে নেই। তারপরেও আমাদের ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে হল। খাওয়ার পর সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আমরা রওনা দিয়ে দিলাম।

সাধারণত গাড়ি ছাড়তেই নিশাত আপু সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এবারে কেন জানি আর ঘুমালেন না। পিছনে বসে বসে আমাদের গল্পগুজবে

আমারবই.কম
amarboi.com

মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগলেন। রিতু গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাই সে নিশাত আপুর সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে থাকে। ডাক্তারি পড়া কি কঠিন, যখন লাশ কাটতে হয় তখন কি ভয় করে, যদি কোনো রোগী মারা যায় তখন কি মন খারাপ হয় এ ধরনের নানা রকম প্রশ্ন! শান্তা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আগে বান্দরবান গিয়েছেন?"

নিশাত আপু হেসে বললেন, "কতো বার! আমার কিছু করার না থাকলেই বান্দরবানে চলে আসি।"

সুজন জিজ্ঞেস করল, "বান্দরবানে কি বান্দর আছে?"

"আছে। আগে আরো অনেক বেশি ছিল, এখন কমে গেছে।"

মামুন সুজনকে বলল, "তুই যখন যাবি, তখন আবার একটা বেড়ে যাবে।"

আমরা সবাই হাসলাম, সুজনও হাসল, বলল, "ঠিকই বলেছিস, আমার সব সময় মনে হয় মানুষ না হয়ে যদি বান্দর হয়ে জন্মাতাম তা হলে কী মজাটাই না হত! সারা দিন এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফাতে পারতাম!"

রিতু বলল, "তুই মন খারাপ করিস না। আমরা তোকে রেখে আসব। তুই মনের সুখে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফাতে পারবি!"

আমি নিশাত আপুকে জিজ্ঞেস করলাম, "বান্দরবানে আমরা কোথায় থাকব?"

"নূতন একটা রিসোর্ট তৈরি হয়েছে সেখানে। ছোট চাচা, মানে আঁখির আব্বুর একজন বন্ধু তৈরি করেছেন। পাহাড়ের উপর একেবারে ছবির মতন। নিচে তাকালে দেখা যায় শঙ্খ নদী।"

সুজন বলল, "খাওয়া দাওয়া?"

"সেখানেই হবে। খুব মজার খাবার তৈরি করে। আমি যতবার যাই ততবার খেয়েদেয়ে আরো মোটা হয়ে আসি!"

সুজন জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে?"

"গভীর জঙ্গলে নিশ্চয়ই বন্য পশুপাখি আছে। আমরা যেখানে থাকব সেখানে নেই। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "আমরা সেখানে কী করব?"

"তোমাদের ইচ্ছা। শঙ্খ নদীতে নৌকা করে গভীরে যেতে পার। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে পার। কিছু করার ইচ্ছে না করলে রিসোর্টের বারান্দায় চুপচাপ বসে থেকে জঙ্গলের শব্দ পাখির ডাক শুনতে পার।"

আঁখি বলল, "সেটাও যদি করার ইচ্ছা না করে তা হলে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমাতে পারিস!"

আমরা হি হি করে হাসলাম, সুজন বলল, "ইস! আমরা এতো দূর থেকে ঘুমানোর জন্যে এসেছি নাকি?"

আমরা যখন বান্দরবানে আমাদের রিসোর্টে পৌঁছেছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ি রাস্তায় একেবারে গভীর জঙ্গলে অনেকদূর যাবার পর আমরা একটা বড় গেটের সামনে থামলাম। পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে, সেই সিঁড়ি ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা উপরে উঠে গেলাম। ভালো জামাকাপড় পরা একজন কমবয়সী মানুষ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, আমাদের দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, "এসো এসো, সবাই এসো। আমরা অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। ভেবেছিলাম তোমরা আরো আগে পৌঁছবে!"

জাবেদ চাচা বললেন, "আমরা খুব ধীরে সুস্থে এসেছি ম্যানেজার সাহেব। কোথাও কোনো তাড়াহুড়ো করি নি। স্যার বলে দিয়েছিলেন প্রতি দুই ঘণ্টা পর থামতে।"

"সেটাই ভালো।" ম্যানেজার সাহেব বললেন, "তোমরা এসো তোমাদের রুমগুলো দেখিয়ে দিই। তোমাদের ছয়জনের জন্যে আমি সবচেয়ে ভালো ঘরগুলো রিজার্ভ করে রেখেছি। একেবারে পাহাড়ের উপর দুইটা রুম, তিনজন তিনজন করে ছয়জন। এসো আমাদের সাথে।"

আমরা ম্যানেজারের পিছনে পিছনে হেঁটে যেতে থাকি। আঁখি রিতুকে ধরে হাঁটছে, আমি আঁখির পিছনে। রিসোর্টের দুইজন মানুষ পিছনে পিছনে আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে আসতে থাকে। আমরা গাছগাছালি ঢাকা একটা পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে মনে হয় আরো একটা পাহাড়ের উপর উঠে গেলাম। সেখানে কাঠের একটা বাসা, দুইপাশে দুইটা রুম। ম্যানেজার সাহেব রুমগুলো খুলে বললেন, একটাতে তিনজন অন্যটাতে তিনজন, নিজেরা নিজেরা ঠিক করে নাও কে কোথায় থাকবে!"

রিতু একটা ঘরে ঢুকে এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমরা এইটাতে থাকব।"

কাজেই আমি সুজন আর মামুন অন্যটা নিয়ে নিলাম। হোটেলের মানুষগুলো আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে এসেছে। তারা সেগুলো আমাদের রুমে পৌঁছে

আমাবই কম
amaboi.com

দিয়েছে। আঁখি জিজ্ঞেস করল, "নিশাত আপু আর জাবেদ চাচা, আপনারা কোথায় থাকবেন?"

ম্যানেজার সাহেব বললেন, "পাশের ব্লকে। তোমাদের কোনো ভয় নেই গাছপালায় আড়াল হয়ে আছে কিন্তু জোরে ডাক দিলেই শুনতে পাবে।"

"আর ড্রাইভার চাচা?"

"তাকে নিয়েও তোমার চিন্তা করতে হবে না। নিচে তার জন্যেও থাকার জায়গা আছে। তোমরা হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে যাও, আমাদের নিচে ডাইনিং রুমে খাবার দিয়ে তোমাদের ডেকে নেব। আজকের মেনু স্যার টেলিফোনে ঠিক করে দিয়েছেন। কাল থেকে তোমরা বলবে কোন বেলায় তোমরা কী খেতে চাও।"

ম্যানেজার সাহেব আমাদেরকে রেখে নিশাত আপু আর জাবেদ চাচাকে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা নিজেদের রুমে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম। বাথরুমে সাবান শ্যাম্পু টুথব্রাশ টুথপেস্ট এমনকি দাড়ি কামানোর জন্যে রেজর পর্যন্ত আছে। আমাদের দাড়ি গজায় নি বলে ব্যবহার করতে পারব না! সবার জন্যে ধবধবে সাদা পরিষ্কার টাওয়েল। তিনটা বিছানা তিন দিকে। চাদরগুলোও ধবধবে সাদা। বড় কাচের জানালা, ভারী পর্দা। সুন্দর একটা টেবিল। ঘরটার মেঝে মনে হল কাঠ দিয়ে তৈরি, ঘরের বাইরে বড় বারান্দা সেখানে খুব সুন্দর হেলান দেয়া চেয়ার।

কিছুক্ষণের মাঝেই আঁখি, রিতু আর শান্তাও বের হয়ে এলো। আমরা তখন পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। এক পাশে বড় ডাইনিং রুম, সেখানে আমাদের জন্যে আলাদা করে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। নিশাত আপু আর জাবেদ চাচা আগেই সেখানে বসে আছেন। ডাইনিং রুমের মাঝে আলাদা আলাদা টেবিলে আরো অনেকে বসে আছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে, কেউ খেয়ে গল্পগুজব করছে। আমাদের দিকে সবাই একনজর তাকিয়ে নিজেদের মাঝে ব্যস্ত হয়ে গেল। কেউ দ্বিতীয়বার ঘুরে তাকাল না। আঁখি একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো হেঁটে এসেছে, চেয়ারে বসেছে গল্পগুজব করছে কেউ সন্দেহ করল না যে সে অন্যরকম।

আঁখি ফিসফিস করে বলল, "বুবলি? এই জীবনের প্রথম কেউ আমাকে দেখে আহা উহু করছে না! কী মজা।"

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "দেখিস, কেউ বুঝতেই পারবে না।"

আমরা অনেক সময় নিয়ে খেলাম। তারপর নিজেদের রুমে ফিরে গেলাম। বারান্দায় চেয়ারগুলোতে বসে আমরা নিচু স্বরে গল্প করতে থাকি। আকাশে অপূর্ব একটা চাঁদ উঠেছে আর তার নরম জোছনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাসে গাছের পাতা শিরশির করে নড়ছে। বহু দূর থেকে কোনো একটা বুনো প্রাণীর ডাক শুনলাম। মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলো পাখি কেমন যেন দুঃখী গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। আঁখি প্রথমে গুনগুন করে তারপর নিচু গলায় গান গাইতে শুরু করল, "আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে"। কী সুন্দর তার গলা।

আঁখি তো জোছনা দেখছে না তা হলে কেমন করে জানল আমরা জ্যোৎস্নারাতে বনে এসেছি?

আমারবই.কম amarboi.com

১০
যখন সবকিছুই ঠিক ঠিক চলছিল কিন্তু না বুঝেই আমরা একটা খুব বড় বিপদে পা দিয়ে ফেললাম

খুব সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ বুঝতে পারলাম না আমি কোথায়। হঠাৎ করে মনে পড়ল তখন আমি উঠে বসে চারিদিকে তাকালাম। রাত্রিবেলা উজ্জ্বল আলোতে ঘরটাকে এক রকম লেগেছিল, সকালের আবছা আলোতে আবার অন্যরকম লাগছে। আমি বিছানা থেকে নেমে অন্য দুটি বিছানায় শুয়ে থাকা মামুন আর সুজনকে দেখলাম। প্রত্যেকটা মানুষের মনে হয় ঘুমানোর নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। মামুন দুই হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়েছে—সুজন ঘুমিয়েছে একেবারে গুটিসুটি মেরে। আমি তাদেরকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। চারিদিকে অনেক গাছ, সেই গাছে হাজার হাজার পাখি কিচিরমিচির করছে। আমি নিচে তাকালাম, অনেক নিচ দিয়ে একটা নদী এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই শঙ্খ নদী। পাহাড় জঙ্গল নদী কোথাও কোনো মানুষ নেই। নির্জন সুনসান দেখে কী অবাক লাগে।

আমি চুপচাপ অনেকক্ষণ বসেছিলাম তখন খুট করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি দরজা খুলে ঘুম ঘুম চোখে রিতু বের হয়ে আসছে। আমাকে দেখে বলল, "তুই এখানে বসে আছিস? কতক্ষণ থেকে?"

"ঘুম ভেঙে গেল, তাই বসে আছি।"

রিতু বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওমা! কী সুন্দর।"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর।"

"সবচেয়ে সুন্দর কোন জিনিসটা, বল দেখি?"

"কোনটা?"

"কোনো টেম্পো গাড়ি নাই। মানুষজন নাই। চিৎকার চেঁচামেচি নাই।"

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, "ঠিকই বলেছিস।"

রিতু কিছুক্ষণ আমার পাশে চুপচাপ বসে থেকে বলল, "এই হোটেলটা কী সুন্দর দেখেছিস?"

আমি বললাম, "হোটেল না! এইটা হচ্ছে রিসোর্ট।"

"দুইটার মাঝে পার্থক্য কী?"

আমি বললাম, "জানি না। মনে হয় হোটেল হচ্ছে বড়লোকদের জন্য আর রিসোর্ট হচ্ছে আরো বেশি বড়লোকদের জন্য।"

রিতু হাসল। বলল, "হ্যাঁ এখানে সবকিছুর মাঝে একটা বড়লোক বড়লোক ভাব। কালকে রাতে যখন আমরা খাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই কয়েক হাজার টাকা বিল হয়েছে!"

"আমাদের এই ঘরগুলোও নিশ্চয়ই এক দিনে কয়েক হাজার টাকা ভাড়া।"

রিতু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস। বড়লোকেরা কীভাবে থাকে সেটা একটু আন্দাজ হল!"

আমরা হি হি করে হাসলাম।

কিছুক্ষণের মাঝে অন্যেরাও ঘুম থেকে উঠে গেল, তখন সবাই মিলে হইচই করে বাথরুমে গিয়ে রেডি হতে থাকি। আমরা যখন স্কুলে একজন আরেকজনকে দেখি তখন একভাবে দেখা হয়, আর যখন এভাবে একসাথে থাকি তখন অন্যভাবে দেখা হয়। যেমন মামুন হচ্ছে আমাদের মাঝে সায়েন্টিস্ট মানুষ, তার হওয়ার কথা ভুলাভালা টাইপের কিন্তু সে হচ্ছে সবচেয়ে চটপটে। সুজন হচ্ছে দুষ্টু মাথার ওয়ান তার হওয়ার কথা সবচেয়ে চটপটে সে হচ্ছে সবচেয়ে ঢিলে! বাথরুমে ঢুকলে বেরই হতে চায় না।

এর মাঝে একসময় নিশাত আপু এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে গেলেন। বলেছেন আটটার ভিতরে ডাইনিং হলে চলে আসতে, নাস্তা খেয়ে আমরা বের হব। আমরা আটটার আগেই সবাই ডাইনিং রুমে চলে এসেছি। ভোরবেলা

আমারবই.কম amarboi.com

অনেকে নাস্তা করেই বের হয়ে যাবে। সকালেও আঁখি ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মতো হেঁটে এসেছে। আমরা এবারে আরেকটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, রিসোর্টের ম্যানেজার নিশ্চয়ই আঁখির ব্যাপারটা জানে কিন্তু কোন জন আঁখি ধরতে পারছেন না। রিতু তখন দুষ্টুমি করে ভান করতে লাগল সে দেখতে পায় না। কোনো কিছু ধরার আগে একটু হাত বুলিয়ে জিনিসটা দেখে সোজা একদৃষ্টে একদিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না! ম্যানেজার সাহেব তখন ধারণা করে নিলেন রিতুই হচ্ছে আঁখি। ডাইনিং টেবিলে খাবার দেয়ার সময় তখন রিসোর্টের সবাই মিলে রিতুর যত্ন করতে লাগল!

নাস্তা করেই আমরা বের হয়ে গেলাম। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, জাবেদ চাচা গাড়িতে ওঠার আগে ড্রাইভার চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, "রতন, পাহাড়ি রাস্তায় তুমি গাড়ি চালাতে পারবে তো? অসুবিধে হলে বল, তা হলে আমরা লোকাল ড্রাইভার নিয়ে একটা চান্সের গাড়ি ভাড়া করে নিই!"

ড্রাইভার চাচা এমনভাবে হেসে উঠলেন যে তার থেকে বোঝা গেল কেউ তার জীবনে এরকম হাস্যকর কথা বলে নি। তিনি থাকতে আরেকজন গাড়ি চালাবে সেটি কিছুতেই হতে পারে না! এধরনের একটা কথা বলাই তার জন্যে বড় ধরনের অপমান।

আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসেছি। আগের মতন ড্রাইভারের পাশের সিটে জাবেদ চাচা। পিছনে নিশাত আপু। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি যেতে থাকে। আমরা শহরে মানুষ হয়েছি কখনো বনজঙ্গল দেখি নি, রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। পাহাড়ি রাস্তা, কখনো উঁচু কখনো নিচু হঠাৎ হঠাৎ দূরে একটা নদী চিকচিক করে ওঠে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

একটা বড় টিলা ঘুরে যাবার সময় হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে বেশ কিছু পুলিশ মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। তারা হাত তুলে আমাদের গাড়ি থামাল। কঠিন চেহারার একজন মিলিটারি গাড়ির ভিতরে আমাদেরকে একনজর দেখে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?"

জাবেদ চাচা বললেন, "এখনো জানি না, বাচ্চাগুলো যতদূর যেতে চায়।"

নিশাত আপু বললেন, "কোনো সমস্যা?"

মিলিটারি মানুষটা কোনো উত্তর না দিয়ে গাড়ির ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

এরকম সময় কমবয়সী আরেকজন মিলিটারি এল, তাকে দেখে কঠিন চেহারার মানুষটা একটা স্যেল্যুট দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার মানে কমবয়সী এই মানুষটা নিশ্চয়ই অফিসার। নিশাত আপু তখন জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, "এখানে কী কোনো কিছু হয়েছে? কোনো সমস্যা?"

কমবয়সী অফিসারটি বলল, "না! আপনাদের কোনো সমস্যা না।"

"তা হলে আপনাদের সমস্যা?"

অফিসারটি হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের তো সব সময়েই সমস্যা! আমাদের কাজই হল সবাইকে সন্দেহ করা, সবার গাড়ি চেক করা।"

রিতু জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী চেক করেন?"

"এই তো! কেউ ড্রাগস নিচ্ছে কি না, আর্মস নিচ্ছে কি না এই সব দেখি।"

রিতু হেসে বলল, "আমরা এসব কিছু নিচ্ছি না।"

অফিসারটি বলল, "জানি! তবু দেখতে হয়। এটাই হচ্ছে আমাদের ডিউটি!" তারপর হাত নেড়ে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল।

আঁখি বলল, "আহা বেচারা।"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "কেন আহা বেচারা?"

"এই যে এরকম একটা সুন্দর জায়গায় থাকে, কিন্তু তাদের কাজটা হচ্ছে সবাইকে সন্দেহ করা!"

আমরা মাথা নাড়লাম, আঁখি ঠিকই বলেছে।

গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে আমরা উপরে উঠতে থাকি। আমাদের মতো আরো অনেকে বেড়াতে এসেছে, মাঝে মাঝেই তারা পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে ছবি তুলছে। আমরাও একটা সুন্দর জায়গায় গাড়ি থামালাম। এক পাশে পাহাড়ি ঢাল তাই আঁখিকে শান্তা ধরে রাখল। আমরাও কিছু ছবি তুললাম, নিশাত আপুর কাছে একটা ভিডিও ক্যামেরা, সেটা দিয়ে ভিডিও করলেন।

আমারবই কম
amarboi.com

আমরা আবার গাড়িতে উঠেছি, আবার গাড়ি করে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পথের পাশে একটা জায়গায় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, অনেক মানুষের ভিড়। শান্তা জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কী হচ্ছে?"

নিশাত আপু বললেন, "একটা ছোট বাজারের মতন। পাহাড়ি মানুষদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি হয়।"

রিতু বলল, "আমরা থামি?"

নিশাত আপু বললেন, "ঠিক আছে।"

আমরা গাড়ি থেকে নেমে আবিষ্কার করলাম, মানুষের ভিড় ঠেলে আমরা যেতে পারব কিন্তু আঁখির বেশ অসুবিধে হবে। সে চোখে দেখতে পায় না বলে তাকে সবকিছু হাত বুলিয়ে দেখতে হয়। এখন যে ঠেলাঠেলি হচ্ছে হাত বুলানো দূরে থাকুক ভালো করে কেউ চোখ দিয়েও দেখতে পাবে না! জাবেদ চাচা বললেন, "সকালে এখানে খুব ভিড় হয়। তোমরা বিকালের দিকে এসো তখন নিরিবিলি ঘুরে দেখতে পারবে।"

আমরা রাজি হয়ে গেলাম। বান্দরবানের পাহাড়ে এসে কারো ভিড় ঠেলাঠেলি করতে ইচ্ছে করছে না।

প্রায় তিন ঘণ্টা পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে আমরা টের পেলাম আমাদের বেশ খিদে পেয়েছে। নিশাত আপু বললেন, "চল এখন রিসোর্টে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে নিই!"

লাঞ্চের কথা শুনে খিদেটা এক মুহূর্তে চাগিয়ে উঠল। খানিকটা দূরে নাকি একটা জলপ্রপাত আছে, আমরা আপাতত সেটা না দেখেই ফিরে আসতে শুরু করি। পেটে খিদে থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কিছুই সুন্দর দেখায় না।

আসার পথে আবার পুলিশ মিলিটারির দলটা আমাদের গাড়িকে থামাল। এবারে আগের অফিসারটি নেই। তাই আবার জাবেদ চাচাকে আমাদের নিয়ে একটু প্রশ্ন করল। আমাদের একনজর দেখে গাড়ির ভিতরে একটু চোখ বুলিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল।

রিসোর্টে পৌঁছে প্রথমেই আমরা ধড়াস করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মামুন বলল, "ঘুরে বেড়ানোর সময় কেউ কোনো কাজ করে না। কিন্তু কেমন পরিশ্রম হয় দেখেছিস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ! বান্দরবান এখনো শুরুই করি নি। রাঙামাটি কক্সবাজার বাকি, এখনই টায়ার্ড হলে কেমন করে হবে?"

সুজন বিছানায় উঠে বসে বলল, "কে বলেছে টায়ার্ড হয়েছি। মোটেই টায়ার্ড হই নি! কী মজা হচ্ছে দেখেছিস? কোনো কিছু নিজেদের করতে হচ্ছে না। খাওয়ার সময় খাওয়া, ঘুমের সময় ঘুম! এই দেখ সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানাটা উল্টাপাল্টা করে গেছিলাম, বাথরুমটা নোংরা করে গেছিলাম কেউ এসে বিছানাটা বানিয়ে দিয়েছে, বাথরুমটা পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে দিয়েছে! কেউ বকা দিচ্ছে না, টেবিল পরিষ্কার করতে দিচ্ছে না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারি! কী মজা।"

মামুন উঠে বসে বলল, "আসলেই! এবারে বেশি মজা হচ্ছে। আরেকবার বেড়াতে গিয়েছিলাম সাথে বড়মানুষেরা ছিল তারা সব সময় ধমক দিচ্ছে, এটা করো না সেটা করো না। এবারে সেগুলো নাই।"

সুজন বলল, "ইচ্ছে হলে বরং আমরাই ধমক দিয়ে দিতে পারব।"

আমিও তাদের সাথে সাথে মাথা নাড়লাম, কিন্তু আমি আগে কখনোই একা একা কোথাও যাই নি। অনেক মজা আর অনেক আরাম হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই আম্মুর কথা মনে হচ্ছে। সেটা অবিশ্যি ওদেরকে বলা যাবে না তা হলে আমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই হাসাহাসি করবে।

ডাইনিং রুমে খাবার টেবিলে বসে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছি তখন নিশাত আপু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সবাই মজা করছ তো?"

"করছি।" শান্তা একটু থেমে বলল, "তবে মাঝে মাঝেই বাসার কথা মনে হচ্ছে।" আমি বললাম, "আমারও!"

"সেটা খুবই স্বাভাবিক। তোমরা প্রত্যেকদিন একেবারে নিয়ম করে বাসায় কথা বলবে। ঠিক আছে?"

"বলব।"

"যখন কথা বলার ইচ্ছে করবে আমাকে বলবে।"

সুজন বলল, "বজলুর সাথে কথা বলে দেখি, ওর নানার কী খবর।"

আঁখি বলল, "আহা বেচারা।"

নিশাত আপু বললেন, "বজলুর টেলিফোন নম্বর আছে কারো কাছে?"

শান্তা বলল, "আছে।" তারপর ব্যাগ থেকে ছোট একটা নোট বই বের করে বজলুর আব্বুর টেলিফোন নম্বর বের করে নিশাত আপুকে দিল। নিশাত আপু ফোন ডায়াল করে টেলিফোনটা সুজনকে ধরিয়ে দিলেন। ফোনে কথা বলার একটু ভদ্রতা আছে সুজন তার ধারেকাছে গেল না, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "বজলু আছে?"

আমারবই.কম amarboi.com

একটু পর বজলু ফোন ধরল, সুজন জিজ্ঞেস করল, "তোর নানা মারা গেছেন?"

সুজনের কথা বলার ধরন দেখে আমরা রীতিমতো চমকে উঠলাম। অন্য পাশ থেকে বজলু কী বলেছে শুনতে পেলাম না কিন্তু শুনলাম সুজন অবাক হয়ে বলছে, "এখনো মারা যান নাই! মনে হচ্ছে মারা যাবেন না? ভালো হয়ে যাবেন? কী সর্বনাশ!"

সুজনের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। সুজন নিশাত আপুকে ফোনটা দিয়ে বলল, "বজলুর খুবই মন খারাপ।"

"কেন?"

"নানা মারা যাবেন সেজন্যে বজলু আসতে পারল না। এখন ওর নানা নাকি ভালো হয়ে যাচ্ছেন! বজলু খুবই বিরক্ত!"

রিতু কিছুক্ষণ সুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই কি সব সময় এভাবে কথা বলিস?"

সুজন অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে কথা বলি?"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "তুই জানিস না তুই কীভাবে কথা বলিস?"

"জানব না কেন? এই যে কথা বলছি।"

রিতু বলল, "না সুজন তোর কথা বলার ধরন ভালো না। তোকে সুন্দর করে কথা বলা শিখতে হবে।"

সুজন মুখ শক্ত করে বলল, "আমাকে তোদের কথা বলা শিখাতে হবে না। আমি অনেক সুন্দর করে কথা বলি।"

ঠিক তখন টেবিলে খাবার দিতে শুরু করল আর আমরা খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তাই সুন্দর করে কথা বলার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। অনেক ভালো ভালো খাবার, চিকেন টিকিয়া, শিককাবাব, পোলাও, সবজি, ঘন ডাল, খাবার পর দই এবং মিষ্টি।

খাওয়া শেষ করে নিশাত আপু বললেন, "বেশি খেয়ে ফেলেছি। এখন বিছানায় শুয়ে টানা ঘুম দিতে পারলে হত।"

রিতু বলল, "আপনি ঘুমান নিশাত আপু।"

"না, না—তোমরা বিকেলে ঐ মার্কেটে যাবে মনে নাই। জাবেদ চাচাকেও শহরে যেতে হবে। যেতে পারবেন না।"

আমি বললাম, "আমরা নিজেরা নিজেরা যেতে পারব।"

শান্তা বলল, "ড্রাইভার চাচা থাকবেন। আমরা তো অন্য কোথাও যাচ্ছি না—মার্কেটে যাব একটু দেখব তারপর চলে আসব। আপনার কষ্ট করে আমাদের সাথে যেতে হবে না।"

নিশাত আপু তার পরেও খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, "না না, চাচা একশবার বলে দিয়েছেন তোমাদেরকে যেন একা ছাড়া না হয়।"

আঁখি হি হি করে হেসে বলল, "আমরা ছয়জন একা হলাম কেমন করে?"

সুজন বলল, "সাথে ড্রাইভার চাচা।"

নাদুসনুদুস মোটাসোটা মানুষের ঘুম খুব প্রিয়, তাই নিশাত আপু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। আমাদেরকে গাড়িতে তুলে অনেক রকম উপদেশ দিয়ে নিশাত আপু ঘুমাতে গেলেন। ড্রাইভার চাচা আমাদের ছয়জনকে নিয়ে রওয়া দিলেন মার্কেটে।

আমরা গাড়িতে চেঁচামেচি করে যেতে থাকি। বেসুরো গলায় গান গাইতে থাকি, সেই গান শুনে আঁখি হেসে কুটি কুটি হয়ে যায়। রাস্তায় আবার সেই পুলিশ আর মিলিটারির ব্যারিকেড—এবারে আমরা সকালের অফিসারটাকে পেয়ে গেলাম। আমাদেরকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা আবার?"

আমরা বললাম, "জি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"মার্কেটে।"

"যাও।"

রিতু জিজ্ঞেস করল, "আপনি গিয়েছেন মার্কেটে?"

অফিসারটি হাসল, "ঘুমানোর সময় পাই না—আর মার্কেট!"

"আপনার কিছু লাগবে মার্কেট থেকে?"

অফিসারটি হাসল, "না, মা লাগবে না।"

ড্রাইভার চাচা তখন গাড়ি ছেড়ে দিল। রিতু কতো সহজে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, এই কথাটাই যদি আমি বলতাম কী বেখাপ্পা শোনাতো। আর সুজন যদি বলত তা হলে নির্ঘাত একটা মারামারি লেগে যেত।

জাবেদ চাচার কথা সত্যি। এখন মার্কেটে সেরকম ভিড় নেই। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আর মেয়েরা একটু কেনাকাটা করল। সুজন শুধু একটা তামাক

আমারবই.কম
amarboi.com

খাবার বাঁশের পাইপ কিনল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কেন কিনেছিস? তুই কি পাইপ খাস?"

"বড় হয়ে খাব তাই কিনে রাখলাম।" এই কথায় আর কী জবাব দেয়া যায়?

আমরা যখন ফিরে আসছি তখন একটা মোড় ঘুরতেই দেখলাম পথের মাঝে একটা ভ্যান উল্টে পড়ে আছে, রাস্তায় কয়েকটা টুকরি, টুকরিতে শাকসবজি, কিছু শাকসবজি টুকরিতে কিছু রাস্তায় পড়ে আছে। ভ্যানের পাশে একজন বুড়ো মতো মানুষ হতাশভাবে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। শান্তা বলল, "আহা বেচারা।"

আঁখি বলল, "কী হয়েছে?"

"একজন বুড়ো মানুষের ভ্যান উল্টে তার শাকসবজি রাস্তায় পড়ে গেছে।"

তখন আঁখিও বলল, "আহা বেচারা।"

বুড়ো মানুষটা আমাদের গাড়ি দেখে হাত তুলল, ড্রাইভার চাচা গাড়ি থামিয়ে বললেন, "কী হল।"

"আমার সবজিগুলো একটু তুলে পৌঁছে দেবেন।"

ড্রাইভার চাচা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আমরা তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গাড়ি থেকে নেমে সবজিগুলো টুকরিতে তুলে দিলাম। রিতু জিজ্ঞেস করল, "আপনি ব্যথা পেয়েছেন?"

বুড়ো মতন মানুষটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "একটু পেয়েছি।" তারপর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভ্যানটা তো গেছে সবজিগুলো বাজারে নেয়া দরকার, তোমাদের গাড়ি করে একটু পৌঁছে দেয়া যাবে মা?"

রিতু বলল, "আমাদের হোটেল পর্যন্ত যেতে পারেন।"

মানুষটা বলল, "তা হলেই হবে। আমি বাকিটা নিয়ে যেতে পারব।"

ড্রাইভার চাচা কেন জানি পুরো ব্যাপারটাতে খুবই বিরক্ত হলেন, কিন্তু আমরা বুড়ো মানুষটাকে তার সবজিসহ তুলে নিলাম। মানুষটা বারবার বলতে লাগল, "বুড়ো মানুষ, শরীরে আর জোর পাই না। তোমরা তুলে না নিলে কী করতাম কে জানে! আজকাল মানুষের মনে দয়া মায়া নাই।"

যখন গাড়ি ছেড়েছে তখন বুড়ো মানুষটা সবজির টুকরিগুলো ধাক্কা দিয়ে সিটের নিচে ঠেলে দিতে লাগল। আমি বললাম, "সিটের নিচে ঢুকাতে হবে না। বাইরে থাকুক।"

বুড়ো মানুষটা বলল, "না, না, একটু চোখের আড়াল করে দিই। তোমাদের এতো সুন্দর গাড়িতে এই শাকসবজি, আলু, কদু দেখতে কি ভালো লাগবে?"

আমরা মানুষটাকে বোঝাতে পারলাম না যে সবজির টুকরি বাইরে থাকলে কিছুই আসে যায় না!

আমরা যখন বেশ অনেকদূর চলে এসেছি তখন হঠাৎ করে বুড়ো মানুষটা কেমন জানি চমকে উঠল, একবার নিজের কোমরে হাত দিল তারপর এদিক সেদিক কী একটা খুঁজতে লাগল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"আমার ব্যাগ।"

"কী ব্যাগ?"

"টাকাপয়সার ব্যাগ—মনে হয় ওখানে পড়ে গেছে!" মানুষটা কেমন জানি ব্যস্ত হয়ে গেল, "ড্রাইভার সাহেব! গাড়িটা একটু থামান।" ড্রাইভার চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন?"

"আমাকে নামিয়ে দেন, আমার ব্যাগ ফেলে এসেছি।"

রিতু বলল, "আপনার সবজির টুকরি?"

"গাড়িতে থাকুক। আমার লোক গাড়ি থেকে নিয়ে নেবে।"

ড্রাইভার চাচা গাড়ি থামালেন, বুড়ো মানুষটা হুড়মুড় করে গাড়ি থেকে নেমে গেল। বেচারা গরিব মানুষ, এখন তার টাকার ব্যাগটা খুঁজে পেলে হয়।

ড্রাইভার চাচা বিরক্ত হয়ে বুড়ো মানুষটাকে একটা গালি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। একটু সামনেই আবার পুলিশ ব্যারিকেড, অনেকগুলো গাড়ি থামিয়ে চেক করছে। গাড়ির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলে দেরি হত। কিন্তু মিলিটারির সেই অফিসারটা আমাদের দেখল। বলল, "মার্কেটিং করেছ?"

"জি। করেছি।"

"গুড। যাও। তোমরা চলে যাও।

ড্রাইভার চাচা অন্যদের পাশ কাটিয়ে চলে এলেন। আমরা যখন আমাদের রিসোর্টের কাছে এসেছি তখন হঠাৎ দেখলাম রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো

আমারবই.কম amarboi.com

মানুষটা হাত নাড়ছে। ড্রাইভার চাচা গাড়ি থামালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি না পিছনে গেলেন, এখন সামনে চলে এসেছেন কেমন করে?"

বুড়ো মানুষটাকে তার উত্তর দেবার জন্য খুব বেশি আগ্রহ দেখা গেল না, হাত নেড়ে বলল, "ঐ তো একজনকে পেয়ে গেলাম, হোন্ডায় নামিয়ে দিল!"

ড্রাইভার চাচা বললেন, "দেখলাম না তো কোনো হোন্ডা।"

বুড়ো মানুষটা বলল, "খুলেন, খুলেন, টুকরিগুলো দেন।" বলে নিজেই দরজা খুলে তার টুকরিগুলো নিতে থাকে।

সুজনকে হঠাৎ কেমন জানি উত্তেজিত দেখায়। সে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আমি তার দিকে তাকালাম, এর আগে কখনো দেখি নি যে সুজন কোনো কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছে। বুড়ো মানুষটা একা নয়, হঠাৎ করে কোথা থেকে বেশ অনেকগুলো মানুষ জড়ো হয়েছে, তারা সবাই মিলে খুব তাড়াতাড়ি টুকরিগুলো নামিয়ে নিল। কাছেই একটা "চান্দের গাড়ি" দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাতে তুলে গাড়িটা দ্রুত সামনের দিকে চলে যায়।

ড্রাইভার চাচা গজগজ করতে করতে বললেন, "আমরা তার মাল সামান এনে দিলাম, সেই জন্যে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না, সেটা খেয়াল করেছ?"

আমরা আসলে সেটা খেয়াল করি নি, ড্রাইভার চাচার কথা শুনে মনে হল তার কথা সত্যি। আমরা যখন প্রথম গাড়িতে সবজির টুকরিগুলো তুলেছি তখন বুড়ো মানুষটার খুবই কাঁচুমাচু ভাব ছিল, যখন টুকরিগুলো নামানোর সময় হল তখন বুড়ো মানুষটার হাবভাব রীতিমতো রুক্ষ। তবে সেটা নিয়ে আমরা বেশি মাথা ঘামালাম না, একটা মানুষকে বিপদের সময় সাহায্য করেছি সেটাই বড় কথা। সেই মানুষের যদি ভদ্রতা বা কৃতজ্ঞতা না থাকে আমরা কী করব?

রিসোর্টের সামনে গাড়ি থামল, প্রথমে মামুন নামল। তারপর আঁখি, তারপর রিতু আর শান্তা। আমি যেই নামতে যাব সুজন তখন খপ করে আমার হাত ধরল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হয়েছে সুজন?"

সুজন তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ–স–স–স।"

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

সুজন ফিসফিস করে বলল, "বুড়ো মানুষটার সবজির টুকরিতে কী ছিল জানিস?"

"কী?"

"এই দেখ।" সুজন তার ব্যাক পেকের মুখটা খুলে দেখাল, আমি তাকিয়ে দেখলাম সবুজ রংয়ের গোল মতন একটা জিনিস। আমি ভালো করে তাকালাম, তারপর ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম, "গ্রেনেড!"

"হ্যাঁ।"

"তুই কেমন করে পেলি?"

"হাত দিয়ে দেখছিলাম কী আছে, দুটি সরিয়েছি।"

"কেন?"

সুজন ঢোক গিলে বলল, "জানি না।"

আমি সুজনের দিকে আর সুজন আমার দিকে তাকিয়ে রইল!

আমারবই.কম amarboi.com

১১
যখন আমরা কাদের বজ্র নামে ভয়ংকর নিষ্ঠুর একজন অস্ত্র ব্যবসায়ীর কথা জানতে পারলাম

আমি সুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কী করবি?"

সুজন শুকনো মুখে বলল, "জানি না। তুই বল কী করব?"

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম "বড়দের বলতে হবে। নিশাত আপু আর জাবেদ চাচাকে।"

সুজন বলল, "আমি বলতে পারব না। তুই বল।"

"আমি কী বলব?"

"যেটা হয়েছে সেটাই বলবি।"

"তুই বুঝতে পেরেছিস আমরা কী করেছি? মিলিটারি পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে যাদের ধরার চেষ্টা করছে আমরা তাদেরকে সাহায্য করেছি। আমরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ আমাদের গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছি!"

সুজন শুকনো মুখে বলল, "তার মানে আমরাও এখন অপরাধী? পুলিশ এখন আমাদের ধরবে।"

আমি মাথা নাড়লাম, "মনে হয়।"

সুজন বলল, "কিন্তু আমরা তো ইচ্ছে করে করি নি। বুড়ো বদমাইশটাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।"

"সেটা পুলিশকে বলে দেখ তারা কী বলে! তারা আমাদের বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের গাড়ি চেক করবে না বুড়োটা সেটা জানে, সেই জন্যেই বুড়োটা তার টুকরিগুলো আমাদের গাড়িতে তুলেছে। কেউ যেন দেখতে

না পায় সেজন্যে ঠেলে ঠেলে সিটের নিচে রেখেছে। চেকআপ করার আগে নেমে গেছে। আমাদের পুলিশকে বলা উচিত ছিল একজন লোকের সবজির টুকরি আমরা নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা চেক করে দেখেন।"

সুজন মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস।"

"এখন বলে কী লাভ?" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "আর তুই কেন খামোখা সবজির টুকরি ঘাঁটতে গেলি? সবজির টুকরি থেকে তুই যদি এই গ্রেনেডগুলি খুঁজে বের না করতি তা হলে আমরা কোনোদিন জানতেও পারতাম না যে এর ভেতরে এগুলো আছে। আমরা ভাবতাম আমরা একজন বুড়ো মানুষকে সাহায্য করেছি। সেটা চিন্তা করে খুশি থাকতাম!"

সুজন বলল "এখন সেটা বলে লাভ নেই। কী করবি তাড়াতাড়ি ঠিক কর সবাই না হলে সন্দেহ করবে।"

মামুন বাথরুমে ঢুকেছে, আমি অন্যদের বলেছি আমরা নিচ থেকে আমাদের রুমগুলোর ছবি তুলব, সেজন্যে একটু বাইরে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে একটা গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুজনের সাথে কথা বলছি, সুজনের পিঠে তার ব্যাক পেক সেটার ভিতরে দুইটা তাজা গ্রেনেড। আমি বললাম, "যাই করি আর না করি সবার আগে এই গ্রেনেড দুইটা তোর ব্যাক পেক থেকে বের করে এখানে কোথাও রাখ।"

সুজন গ্রেনেড দুটি বের করল। গাঢ় সবুজ রংয়ের উপরে হাঁজকাটা। ঠিক সিনেমাতে যেরকম দেখেছি। সুজন একটা রিং ধরে বলল, "এই রিংগুলি কী? টান দিলে কী হবে?"

আরেকটু হলে সুজন সত্যি সত্যি টান দিয়ে পিনটা খুলে ফেলত, আমি থামালাম, "সর্বনাশ! পিন খুললেই সাত সেকেন্ড পরে গ্রেনেড ফেটে যায় জানিস না? সবাইকে মারবি নাকি?"

সুজন জানত না। আমরা সবাই যেরকম একশ রকম বই পড়ি একশ রকম জিনিস জানি, সুজন সেইরকম না। সে বই পড়ে কম কিন্তু একশ রকম দুষ্টুমি জানে। তার দুষ্টুমির ফল হচ্ছে এই দুইটা গ্রেনেড। আমরা গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে গ্রেনেড দুটি রেখে কয়েকটা শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে ফেলে বের হয়ে এলাম। আমাদের ঘরের বারান্দায় রিতু আর শান্তা দাঁড়িয়ে নিচে আমাদের দেখে বলল, "তোরা ওখানে কী করছিস?"

আমি বললাম, "ছবি তুলছি। তোরা দাঁড়া, তোদেরও একটা ছবি তুলি।"

আমারবই.কম amarboi.com

রিতু আর শান্তা দুজন দুজনকে ধরে একটা নেকু নেকু ভঙ্গিতে দাঁড়াল, আমি একটা ছবি তুললাম। ছবি তুলে আমরা আমাদের রুমের দিকে আগালাম। আমি এখনো বুঝতে পারছি না বিষয়টা অন্য সবাইকে বলা ঠিক হবে কি না। আমাদের মাঝে রিতুর বুদ্ধি বিবেচনা সবচেয়ে বেশি, ব্যাপারটা তার সাথে আলোচনা করতে পারলে হত, কিন্তু কীভাবে আলোচনা করব বুঝতে পারছিলাম না। রিতুকে আলাদাভাবে পাওয়া দরকার কিন্তু সে সারাক্ষণই অন্যদের সাথে কথা বলছে, গল্পগুজব করছে। এক হতে পারে শুধু রিতুকে না বলে সবাইকে ব্যাপারটা খুলে বলি। শান্তা অল্পতেই ঘাবড়ে যায়, পুরোটা জানলে ভয় পেতে পারে। আঁখিকে এখন জানানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। সে আমাদের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে আর আমরা অস্ত্র চোরাচালানির দলের সাথে গোলমাল শুরু করেছি এই কথাগুলো তাকে বলব কেমন করে? এই মানুষগুলি যখন ফিরে গিয়ে দেখবে তাদের ট্রকরিতে দুইটা গ্রেনেড কম তখন কি আর সেই দুইটা গ্রেনেডের জন্যে ফিরে আসবে না? আর যখন বুঝতে পারবে আমরা জেনে গেছি তখন কি আমাদের ছেড়ে দেবে? খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলবে না আমরা কোথায়? ভয়ে দুশ্চিন্তায় আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে যাবার অবস্থা।

আমরা জাবেদ চাচাকে খুঁজে পেলাম না। নিশাত আপু বললেন শহরে গিয়েছেন, আমরা রাঙামাটি কীভাবে কোন পথে যাব সেসব ব্যাপারে খোঁজ নিতে। রাতে খাবার সময়ে থাকবেন। কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমি আর সুজন তখন হোঁকহোঁক করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অন্যেরা বসে বসে ফোর টুয়েন্টি খেলছে আমরা তাদের সাথে খেলতেও পারি না, আবার কিছু না করে বসেও থাকতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত জাবেদ চাচার সাথে দেখা হল। আমি বললাম, "জাবেদ চাচা, আপনার সাথে আমাদের একটু কথা বলতে হবে।"

জাবেদ চাচা খুব কম কথা বলেন, তারপরেও হাসি হাসি মুখে বললেন, "তোমাদের সাথেও আমার কথা বলতে হবে।"

"আমাদেরটা খুবই জরুরি।"

জাবেদ চাচার মুখের হাসিটা আরো বড় হল, "আমারটাও খুবই জরুরি।"

"আগে আমাদেরটা বলি?"

"বলবে? বল।"

আমরা যখন বলতে শুরু করলাম ঠিক তখন নিশাত আপু ঘরে ঢুকলেন, খাওয়াদাওয়া হোটেল বিল এই সব নিয়ে কথা বলতে লাগলেন. তাই আমাদের আর বলা হল না। জাবেদ চাচা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা ডাইনিং টেবিলে খেতে খেতে কথা বলি?"

আমরা আর কী করব? মাথা নেড়ে রাজি হয়ে চলে এলাম।

রাতে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছি। আজকে চাইনিজ খাবার, দেখে জিবে পানি এসে যাবার কথা কিন্তু আমার আর সুজনের ভেতরে এতো অশান্তি যে শান্তিমতো খেতে পারব এরকম মনে হচ্ছে না। খাওয়া যখন প্রায় মাঝামাঝি তখন নিশাত আপু আর জাবেদ চাচা এলেন। জাবেদ চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের খবর কী? সবাই ভালো?"

আমি আর সুজন চুপ করে রইলাম, অন্যেরা মাথা নেড়ে কেউ বলল, "ভালো।" কেউ বলল, "খুবই ভালো" কেউ বলল, "ফাটাফাটি" কেউ বলল, "সুপার ডুপার।"

জাবেদ চাচা বললেন, "একেক জায়গায় আমরা দুই রাত করে থাকব। কাজেই বান্দরবানে এটা শেষ রাত। কাল দুপুরে আমরা রাঙামাটি রওনা দিব।"

আমি আর সুজন আবার চুপ করে থাকলাম, অন্যেরা আনন্দের মতো শব্দ করল। জাবেদ চাচা বললেন, "আজকে আমি শহরে গিয়েছিলাম, সেখানে আমার পরিচিত একজনের সাথে দেখা হয়েছে, সে বলেছে এখন বান্দরবান খুবই গরম একটা জায়গা।"

"গরম?" মামুন বলল, "আমাদের তো সেরকম গরম লাগছে না!"

"এটা অন্য রকম গরম।"

"কী রকম গরম?"

"আর্মসের বিশাল একটা চালান এসেছে এই এলাকায়, পুলিশ মিলিটারি ধরার চেষ্টা করছে।"

আমি আর সুজন একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। রিতু বলল, "মনে নাই পুলিশ মিলিটারি ব্যারিকেড দিয়ে সব গাড়ি চেক করছে?"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "কী রকম আর্মস?"

"একে ফরটি সেভেন। গ্রেনেড।"

"গ্রেনেড?"

"হ্যাঁ গ্রেনেড।"

আমারবই.কম amarboi.com

"সর্বনাশ।"

রিতু জানতে চাইল, "কারা করে?"

"মানুষটার নাম হচ্ছে কাদের। কাদের বক্স। অসম্ভব নিষ্ঠুর একটা মানুষ। কোনো মায়া দয়া নাই। তার একটা বড় দল আছে, পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। পাহাড়ে থাকে, কোথায় থাকে কেউ জানে না।"

আমি আর সুজন একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। সুজন তার শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করে বলল, "মায়া দয়া নাই মানে? কী করে?"

"খুন জখম। নিজের দলের মানুষও যদি একটু উনিশ-বিশ করে তা হলে গুলি করে মেরে ফেলে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেয়।"

"কী সাংঘাতিক।"

আঁখি বলল, "কাদের বক্স যদি খুব সাংঘাতিকও হয় আমাদের তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই। আমরা তো কাদের বক্সের দলের মানুষ না। আমরা তো তার আর্মসের ব্যবসারও কোনো ক্ষতি করছি না।"

আমি বুঝতে পারলাম আমাদের এখন আসল কথাটা বলার সময় হয়েছে। যেই মুখ খুলেছি ঠিক তখন শুনলাম দুপদাপ শব্দ করে কারা যেন দৌড়ে আসছে। কিছু বোঝার আগেই অনেকগুলো মানুষ ছুটে এলো, তাদের সবার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে রেখেছে যেন চেহারা দেখা না যায়, সবার হাতে ভয়ংকর এক ধরনের রাইফেল যেগুলো শুধুমাত্র ইংরেজি সিনেমায় দেখা যায়। মানুষগুলো কয়েকজন ডাইনিং রুমে ঢুকে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। ডাইনিং রুমে যারা খাচ্ছিল তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠে। তখন রাইফেল হাতে একজন বলল, "খবরদার! কোনো শব্দ না।"

সাথে সাথে সবাই চুপ করে গেল।

আঁখি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

আমার গলা দিয়ে শব্দ বের হতে চাইছিল না, কোনোমতে ফিসফিস করে বললাম, "মুখ বাঁধা অনেকগুলো মানুষ, হাতে বন্দুক, ভিতরে এসে ঢুকেছে।"

"এরা কারা?"

"জানি না। মনে হয় ডাকাত।"

"সর্বনাশ!"

মুখ বেঁধে রাখা যে মানুষগুলো ডাইনিং রুমে ঢুকেছে তারা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, তখন একজন চিৎকার করে বলল, "সবগুলো এইখানে।"

রিসোর্টের ভিতরে যারা ছোটাছুটি করছিল তারা তখন ডাইনিং রুমের দিকে আসতে থাকে। এরা কার খোঁজে এসেছে, কাকে পেয়ে গেছে সেটা কেউ বুঝতে পারে নি। শুধু আমি আর সুজন বুঝে গিয়েছি। তাই মানুষগুলি আমাদের টেবিলে এসে যখন খপ করে আমাদের ছয়জনকে ধরে টেনেহিঁচড়ে টেবিল থেকে বের করে নিয়ে আসে তখন সবাই অবাক হয়ে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। শুধু আমি আর সুজন অবাক হলাম না, চিৎকারও করলাম না।

জাবেদ চাচা লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

পিছনে যে মানুষটা ছিল সে রাইফেলটা তুলে তার পিছনটা দিয়ে জাবেদ চাচার বুকে প্রচণ্ড জোরে মেরে বসল। জাবেদ চাচা একটা যন্ত্রণায় শব্দ করে নিচে পড়ে গেলেন। মানুষটা রাইফেলটা জাবেদ চাচার দিকে তাক করে বলল, "আর একটা টু শব্দ করবে তো শেষ করে দেব।"

জাবেদ চাচা আর শব্দ করলেন না, মনে হল তার শব্দ করার ক্ষমতাও নেই। গামছায় মুখ বাঁধা একজন মানুষ হাতের রাইফেলটা সবার দিকে তাক করে বলল, "কেউ যদি নড়াচড়া করেছ, চিল্লাচিল্লি করেছ তা হলে শেষ।"

কেউ এতোটুকু শব্দ করল না। তখন ছয়জন মানুষ আমাদের ছয়জনকে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম লোকগুলো হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাদের সোজা করে নেয়। আমরা এতো ভয় পেয়েছি যে চিৎকার করার শক্তি পর্যন্ত নেই। মানুষগুলো আমাদের নিয়ে রিসোর্ট থেকে বের হয়ে আসে। রাস্তায় দুটো চান্দের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ধাক্কা দিয়ে একটা চান্দের গাড়িতে তুলে দেয়, আমরা ভালো করে ওঠার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। ড্রাইভার পাহাড়ি রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়িটা চালিয়ে নিতে থাকে। পিছন থেকে দ্বিতীয় গাড়িটাও এর পিছনে পিছনে আসতে থাকে।

কে একজন বলল, "চোখ বেঁধে দে সবগুলোর।"

আমরা অন্ধকারে টের পেলাম মানুষগুলো গামছা দিয়ে আমাদের চোখ বেঁধে দিচ্ছে। এতোক্ষণ আবছা আলোতে চারিদিক দেখতে পাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

পুরো ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে আমরা ভালো করে কিছু বুঝেই উঠতে পারছিলাম না। চান্দের গাড়ির মেঝেতে পা গুটিয়ে বসে আছি, ঝাঁকুনিতে ঠিক করে বসেও থাকতে পারছি না, তার মাঝে শুনলাম, শান্তা কাঁদো

আমারবই.কম amarboi.com

কাঁদো গলায় বলল, "কী হচ্ছে এখানে! আমাদের কে নিয়ে যাচ্ছে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

আমি বললাম, "মনে হয় কাদের বক্সের দল।"

রিতু নিচু গলায় বলল, "কাদের বক্সের দল? কাদের বক্সের দল আমাদের ধরবে কেন?"

সুজন বলল, "কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

আমি কারণটা বলতে যাচ্ছিলাম তখন একটা মানুষ হুঙ্কার দিল, "খবরদার একটা শব্দ করবি না। খুন করে ফেলব মুখ খুললে।"

আমরা তখন চুপ করে গেলাম। ভয়ে আমরা কেউ ঠিকভাবে চিন্তাও করতে পারছিলাম না। কী হচ্ছে, আমাদের কোথায় নিচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে গাড়িতে বসে থাকি।

একসময় হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। আমরা শুনলাম মানুষগুলো চাপা গলায় কথা বলছে। তারপর টের পেলাম আমাদের গাড়ি থেকে নামাচ্ছে। চোখ বাঁধা, কিছু দেখতে পাচ্ছি না তার মাঝে আমরা একজন একজন করে হাঁটতে লাগলাম। কে সামনে কে পিছনে বুঝতে পারছি না। একজন আরেকজনকে ধরে হাঁটছি। অন্ধকারে পা পিছলে যাচ্ছিল, এক দুইবার হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেলাম। কোনো একজন লোক তখন আমাদের গালাগাল করে টেনে দাঁড়া করিয়ে দিতে লাগল। মনে হল নিচে নামছি, নামছি তো নামছিই আর থামাথামি নেই। শেষ পর্যন্ত একসময় থামলাম। পানির ছলাৎ ছলাৎ শুনছি, তার মানে কোনো একটা নদীর কাছে এসেছি। ধাক্কা দিয়ে আমাদের কোনো একটা নৌকায় তুলে দিল তারপর নৌকাটা ছেড়ে দিল।

আমরা নিঃশব্দে নৌকায় বসে রইলাম। মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকায় বসে রয়েছি কোনোদিন বুঝি আর নৌকা থামবে না। শেষ পর্যন্ত নৌকা থামল, একজন জিজ্ঞেস করল, "কয়টা বাজে?" অন্যজন উত্তর দিল "সাড়ে আটটা" তখন আমরা বুঝতে পারলাম আসলে সময় খুব বেশি পার হয় নি। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে বুঝি অনন্তকাল।

নৌকা থেকে নামার পর আমরা উপরে উঠতে থাকি। একজনের পিছু আরেকজন, কে সামনে কে পিছনে বুঝতেও পারছি না। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝেই আমাদের কেউ না কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন

মানুষগুলো আমাদের গালাগাল করতে করতে টেনে তুলছিল। বোঝা যাচ্ছিল আমাদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টেনে নিচ্ছে, গাছের পাতা ডাল আমাদের হাতে পায়ে মুখে লেগে যাচ্ছে, হাত পা কেটেকুটে যাচ্ছে কিন্তু এখন সেগুলো নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমরা থামলাম, মনে হল কোনো একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়েছি। দরজায় কেউ একজন ধাক্কা দিল, ভিতর থেকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, "কে?"

আমাদের সাথে যারা ছিল তারা বলল, "আমরা। ছেলেমেয়েগুলো ধরে এনেছি।"

খুট করে দরজা খোলার শব্দ হল। আমাদের পিছনে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আমরা টের পেলাম ভিতরে আরো অনেক মানুষ বসে আছে, সেখানে কেমন যেন বাঁজালো বোটকা একটা গন্ধ। ভারী গলায় কে যেন বলল, "চোখ খুলে দে।"

লোকগুলো আমাদের চোখ খুলে দিল এবং এই প্রথম আমরা পিটপিট করে তাকালাম। ছোট একটা কাঠের ঘর। এক পাশে একটা কাঠের টেবিল, টেবিলের অন্য পাশে একজন একটা চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। টেবিলের এক কোনায় একটা হ্যারিকেন দপদপ করে জ্বলছে। অন্য পাশে একটা লম্বা বেঞ্চ, সেখানে কয়েকজন বসে আছে। যে মানুষগুলো আমাদের ধরে এনেছে তারা এখন তাদের মুখে বাঁধা গামছা খুলে ফেলেছে। হ্যারিকেনের অল্প আলোতে সবাইকে কেমন যেন ভয়ানক দেখাচ্ছে।

চেয়ারে পা তুলে বসে থাকা মানুষটা টেবিল থেকে কালোমতন কী একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে তার পাশে চেয়ারে বসে থাকা মানুষটার কপালে ধরল। আমরা চমকে উঠে দেখলাম কালোমতন জিনিসটা হচ্ছে একটা রিভলবার আর যে মানুষটার কপালে ধরেছে তাকেও আমরা চিনে ফেললাম। এটি হচ্ছে সেই বুড়ো মানুষটি যে আমাদের গাড়িতে সবজির টুকরি তুলে দিয়েছিল। আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না বলে আমরা প্রথমে চিনতে পারি নি। এখন দেখতে পেলাম তার হাত দুটো পিছন থেকে বাঁধা।

আমাদের কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম চেয়ারে পা তুলে বসে থাকা মানুষটা নিশ্চয়ই কাদের বক্স। কী ভয়ংকর! লোকটার চেহারা দেখলেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠে।

আমারবই.কম amarboi.com

ভয়ংকর চেহারার মানুষটা বুড়ো মানুষটার কপালে রিভলবারটা দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এখন দেখা যাক তুমি সত্যি কথা বলেছ না মিথ্যা কথা বলেছ।"

বুড়ো মানুষটা বলল, "আমি সত্যি কথা বলেছি। কাদের ভাই। আপনি ছেলেমেয়েগুলোরে জিজ্ঞেস করেন।"

"সেই জন্যেই তো ওদের ধরে আনলাম। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু দলের মাঝে বেইমানি সহ্য করতে পারি না। আমার জানা দরকার বুড়ো তুমি বেইমানি করেছ কি না!"

"করি নাই।"

"যদি দেখি তুমি করেছ তা হলে এখানেই শেষ। ঠিক আছে?"

বুড়ো মানুষটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ঠিক আছে কাদের ভাই।"

"এই পোলাপানের মুখের কথার ওপর নির্ভর করছে তোমার জীবন।"

বুড়ো মানুষটি কোনো কথা না বলে কেমন যেন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। কাদের বক্স এইবার ভালো করে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "তোমাদের মাঝে নাকি একজন অন্ধ! কই আমার কাছে তো কাউরেই অন্ধ কানা মনে হচ্ছে না।"

আমাদের কিছু বলার আগেই কমবয়সী একজন হাত দিয়ে রিতুকে দেখিয়ে বলল, "ওস্তাদ। ডানদিকের মেয়েটা অন্ধ।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি হোটেলে দেখেছি।"

রিতু কিছু বলল না। আঁখিও কিছু বলল না। কাজটা ভালো হল কিনা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমরাও চুপ করে রইলাম।

কাদের বক্স বলল, "ঠিক আছে কানাবিবি তুমি ডানদিকে সরে যাও।"

রিতু ডান দিকে সরে গেল, চোখে দেখতে না পেলে মানুষ যেভাবে সরে যায় অনেকটা সেভাবে। কাদের বক্স এবারে আমাদের পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা বাকি পাঁচজন এবারে আমাকে একটা সত্যি কথা বল। খবরদার মিথ্যা কথা বলবে না।" কাদের বক্স তখন বুড়ো মানুষটাকে দেখিয়ে বলল, "তোমরা কী এই বুড়োটাকে আগে দেখেছ?"

আমরা মাথা নাড়লাম।

"কখন দেখেছ?"

সুজন বলল, "আমাদের গাড়িতে সবজির টুকরি তুলেছিল।"

"ঐ সবজির টুকরিতে কী ছিল?"

আমি বললাম "গ্রেনেড।"

আমার কথা শুনে আমাদের অন্য সবাই ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। তারা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। কাদের বক্স সন্তুষ্টির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, তার ভাব দেখে মনে হল আমরা যে ব্যাপারটা জানি সেটা জেনে সে খুশি হয়েছে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এখন তোমরা আমাকে বল, তোমরা কি ঐ টুকরি থেকে গ্রেনেড সরিয়েছ?"

সুজন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। সরিয়েছি।"

বুড়ো মানুষটা হাতবাঁধা অবস্থায় লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করে বলল, "বলেছি না আমি? বলেছি না?"

কাদের বক্স গম্ভীর মুখে বলল, "এতো লাফিও না বুড়া মিয়া। এখন আমার শেষ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার উত্তরের উপর নির্ভর করছে তোমার মাথার ভিতর দিয়ে গুলি যাবে নাকি যাবে না।" কাদের বক্স আমাদের দিকে তাকাল, তারপর মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কয়টা গ্রেনেড সরিয়েছ?"

বুড়ো মানুষটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে ভয় পাওয়া চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি সুজনের দিকে তাকালাম তারপর কাদের বক্সের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দুইটা।"

বুড়ো মানুষটা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে বলল, "দেখেছেন কাদের ভাই? দেখেছেন? আমি গ্রেনেড সরাই নাই। এই পাজি বদমাইশ ছেলেমেয়েগুলো সরিয়েছে।"

কাদের বক্স কিছুক্ষণ বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বুড়ার হাতের বাঁধন খুলে দে।"

একজন এসে তার বাঁধন খুলে দেয় এবং সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে বলে, "কাদের ভাই, আপনি একটু অনুমতি দেন আমি পাজি ছেলেমেয়েগুলোকে পিটিয়ে লাশ করে দেই।"

কাদের বক্স বলল, "তার অনেক সময় পাবে বুড়া।" তারপর ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, "গ্রেনেড দুইটা এখন কোথায় আছে?"

আমরা কোনো কথা বললাম না, তখন কাদের বক্স ধমক দিয়ে উঠল, "কোথায় আছে?"

"আমাদের রুমের পিছনে ফেলে দিয়েছি।"

আমারবই.কম amarboi.com

কাদের বক্স আগুনের মতো জ্বলন্ত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। হুঙ্কার দিয়ে বলল, "রুমের পিছনে কোথায়?"

"বড় বড় দুইটা গাছ আছে, তার সাথে ঝোপ। সেই ঝোপের নিচে।"

কাদের বক্স একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চান্দু। তোর উপর দায়িত্ব, গ্রেনেড দুইটা খুঁজে বের করে নিয়ে আসবি।"

চান্দু নামের মানুষটা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে ওস্তাদ।"

এতোক্ষণ আমি আর সুজন ছাড়া আমাদের আর কেউ কথা বলে নাই। এবারে রিতু কথা বলার চেষ্টা করল, বলল, "এখন কি আমরা যেতে পারি?"

কাদের বক্স বলল, "কী বললে?"

"আপনাদের যেসব প্রশ্ন ছিল তার সবগুলোর উত্তর তো জেনে গেছেন। এখন আমাদের কি ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন?"

কাদের বক্স কিছুক্ষণ রিতুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হা হা করে হাসতে শুরু করল। কাদের বক্সের হাসি দেখে অন্যেরাও হাসতে শুরু করে, যেন তারা খুব মজার কথা শুনেছে। হাসতে হাসতে কাদের বক্সের চোখে পানি চলে আসে। একসময় সে হাসি থামায়, তারপর টেনে টেনে বলে, "শুনো কানা মেয়ে। পৃথিবীতে দুইটা জিনিসের ব্যবসায় মুনাফা সবচেয়ে বেশি। একটা হচ্ছে অস্ত্র আরেকটা হচ্ছে মানুষ! আমি অস্ত্রের ব্যবসাও করি মানুষের ব্যবসাও করি। ছেড়ে দেবার জন্যে তোমাদের আমি ধরে আনি নাই! তোমাদের বিক্রি করা হবে। বুঝেছ? রেঙ্গুনের মার্কেটে!"

ভয়ে আতঙ্কে আমাদের সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

১২
যখন আমরা জানতে পারলাম ছোট একটা ঘুপচি ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে কেমন লাগে

আমাদেরকে একটা ঘরের মাঝে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছে। ঘরের ভেতরে কোনো আলো নেই। একটা ছোট জানালা আছে, সেই জানালা দিয়ে বাইরের আবছা আলো ভেতরে একটু খানি এসে মনে হয় অন্ধকারটাকে আরো জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঘরের ভেতরে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কী বলব কেউ কিছু বুঝতে পারছি না। সবার আগে কথা বলল রিতু। আমাদের দিকে ঘুরে বলল, "তিতু আর সুজন তোরা আমাদের বলবি কী হয়েছে? কেন কাদের বক্স আমাদের ধরে এনেছে?"

মামুন বলল, "হ্যাঁ। আমরা কেউ কিছু জানি না, শুধু তোরা দুইজন জানিস?"

শান্তা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "তোরা কোনো একটা ঝামেলা করবি আর তার জন্যে আমরা সবাই বিপদে পড়ব? কী করেছিস তোরা?"

আমি বললাম, "আমরা কিছুই করি নি—"

শান্তা রেগে গিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই করেছিস। তা না হলে আমাদেরকে কেন ধরে এনেছে। বল কী করেছিস?"

সুজন বলল, "আমরা কিছু করি নাই।"

মামুন বলল, "মিথ্যা কথা বলবি না। কী করেছিস বল?"

সুজন বলল, "দেখতে চাচ্ছিলাম টুকরিতে কী আছে? আগে জানলে কি দেখার চেষ্টা করি? গ্রেনেড কেন নিবে টুকরিতে—বুড়ো মানুষটা

আমারবই.কম
amarboi.com

কীরকম বেয়াদপের মতো কথা বলছিল দেখিস নি, জাবেদ চাচাকে খুঁজছিলাম—"

সুজনের এই ছাড়া ছাড়া মাথামুণ্ডুহীন কথাবার্তা শুনে কেউ কিছু বুঝতে পারল না তাই আমাকে পুরো ব্যাপারটা বলতে হল। তখন সবার রাগটা আমার উপর থেকে সরে গিয়ে পুরোপুরি সুজনের উপর পড়ল। শান্তা চিৎকার করে বলল, "তুই তুই তুই—" তারপর রেগে সুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, আমরা কোনোমতে তাকে থামালাম। তখন শান্তা হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, বলতে লাগল, "আমাদের এখন কী হবে! হায় ভগবান! কী হবে আমাদের?"

আমরা কী বলব বুঝতে পারলাম না। মামুন বলল, "কী হবে? আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে! তা না হলে হাত পা ভেঙে লুলা বানিয়ে বিক্রি করে দেবে—"

শান্তা বলল, "এরা অন্ধকারের মাঝে আমাদের ফেলে রেখেছে, কিছু দেখতে পাই না—"

আঁখি এতোক্ষণ কোনো কথা বলে নি, এই প্রথম সে কথা বলল। শান্তার হাত ধরে বলল, "কাঁদে না শান্তা। ছিঃ! কাঁদে না।"

"কেন কাঁদব না? এখন আমাদের কী হবে?"

"আমাদের যে ধরে এনেছে সেটা এতক্ষণে জানাজানি হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। পুলিশ মিলিটারি কি আমাদের খুঁজতে শুরু করে নি? নিশ্চয়ই করেছে। আগে হোক পরে হোক তারা আমাদের পেয়ে যাবে।"

শান্তা কান্না একটু কমিয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। আমি তো আমার আব্বুকে জানি, আমার আব্বু এদের ছেড়ে দেবে ভেবেছিস? ছাড়বে না, খুঁজে বের করবেই। তাই কাঁদিস না। শুধু শান্ত হয়ে অপেক্ষা কর।"

"এই ঘুটঘুটে অন্ধকার—"

আঁখি বলল, "তোদের কাছে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার কাছে কোনো পার্থক্য নেই। তাই বলছি আয় আমরা সবাই মিলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি কী করা যায়। কেঁদে লাভ নেই।"

"এই পাজি সুজনটার জন্যে—"

আঁখি বলল, "কেন সুজনকে দোষ দিচ্ছিস? এটা তো সুজনের দোষ নয়। এই বদমাইশ মানুষগুলোর দোষ। এরা খারাপ মানুষ।"

আঁখির কথায় শেষ পর্যন্ত শান্তা একটু শান্ত হল। আমরা সবাই তখন গোল হয়ে বসলাম কী করা যায় চিন্তা করার জন্যে। বসে বসে আমরা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু ঠিক কী করা যাবে ভেবে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না। তাই আমরা ছোট ঘরটার দেয়ালটায় পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে বসে বসে সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সেই রাতটা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর রাত। মাত্র একদিন আগেই আমরা নিজেরা নিজেরা কথা বলছিলাম যে আমরা কী আনন্দে আছি! কী সুন্দর রিসোর্ট, ডাইনিং রুমে কী মজার খাবার, কী সুন্দর নরম তুলতুলে বিছানা, কী চমৎকার পরিষ্কার বাথরুম। আমাদের কোনো কিছুই নিজেদের করতে হচ্ছে না, কেউ না কেউ আমাদের জন্যে সবকিছু করে দিচ্ছে। সেই অবস্থা থেকে আমরা এসে পড়েছি এই জায়গায়। পেটে খিদে নিয়ে অন্ধকার ঘরে বসে আছি। ঘরের ভেতর দিয়ে পোকামাকড় ইঁদুর ছুটে বেড়াচ্ছে। মশার কামড়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। ফুটফুটে দুটো কম্বল দিয়েছে সেই কম্বলে দুর্গন্ধ, শরীরের কোথাও ঘষা লাগলে মনে হয় শরীরে ছাল উঠে যাবে।

সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে বাথরুমটা। ঘরের এক কোনায় মাটিতে একটা গর্ত। সামনে একটা ছালা টানিয়ে রেখেছে। সেটাই হচ্ছে বাথরুম। সেখানে ভয়ংকর একটা দুর্গন্ধ। সারা ঘরে সেই দুর্গন্ধ পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা সারা রাত ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। মাঝে মাঝে দুই এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ হয়েছে আবার চমকে জেগে উঠেছি। যখন চোখ বন্ধ হয়েছে তখন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। স্বপ্ন দেখেছি কাদের বন্ধ রাইফেল তাক করে হা হা করে হাসছে, কী ভয়ংকর সেই হাসি।

যখন নিশুতি রাত তখন আমরা জঙ্গলের নানা পশুপাখির শব্দ শুনতে পেলাম, কী বিচিত্র তাদের ডাক। কোনো কোনো পশুর গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় বুঝি কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে যায় এবং মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে কোনো এক ধরনের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাই, মনে হয় বহু দূরে নদী দিয়ে স্পিড বোট যাচ্ছে। আমাদের খুঁজতে পুলিশ বের হয়েছে কি না কে জানে।

আমি ভেবেছিলাম সারা রাত নিশ্চয়ই আমি ঘুমাতে পারব না কিন্তু ভোর রাতের দিকে আমার চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি বাসায় আমার বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছি, আমার আম্মু তখন প্লেটে করে আমার জন্যে ঝাল করে মাখানো মুড়ি নিয়ে এসেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস

আমারবই.কম amarboi.com

করলেন, "আচ্ছা তিতু তোদের নাকি কাদের বক্স ধরে নিয়ে গিয়েছিল।" আমি হি হি করে হেসে বললাম, "কী বলছ আম্মু? কাদের বক্স কেন আমাদের ধরে নেবে? এই দেখ না আমি বাসায় আমার বিছানায় বসে আছি?"

ঠিক তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল আর আমি বুঝতে পারলাম আমি বাসায় আমার বিছানায় বসে নাই। আমাকে আর অন্য সবাইকে কাদের বক্স ধরে এনেছে। আমি বুকের ভেতর ভয়ংকর এক ধরনের চাপা আতঙ্ক অনুভব করলাম। বাইরে নিশ্চই আলো হয়েছে কারণ ঘরের ভেতরেও এখন আবছা আলো। ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে অন্যেরা গুটিশুটি মেরে বসে আছে। আমার মতন সবাই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি উঠে জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম, জানালা না বলে সেটাকে বরং একটা ফুটো বলা ভালো, আমি সেই ফুটো দিয়ে বাইরে তাকালাম। আমাদের রাতের বেলা চোখ বেঁধে এনেছে তখন কিছু দেখতে পাই নি। এখন দেখা যাচ্ছে জায়গাটা দুটো টিলার মাঝখানে, চারপাশে গাছগাছালি দিয়ে ঢাকা। সামনে আরেকটা ঘর, সেই ঘরের বারান্দায় একটা মানুষ বসে সিগারেট খাচ্ছে। এই মানুষটা নিশ্চয়ই পাহারা দিচ্ছে, তার ঘাড়ে একটা ভয়ংকর দেখতে রাইফেল। এটাকে নিশ্চয়ই একে ফোর্টি সেভেন বলে। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঘরের দরজাটি খুলে গেল এবং ভিতর থেকে খালি গায়ে একজন মানুষ বের হয়ে আসে, আমি মানুষটিকে চিনতে পারি—কাদের বক্স। কাদের বক্স বগলের তলা দিয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে খানিকক্ষণ চুলকায় তারপর পাহারায় থাকা মানুষটির কাছ থেকে একটা সিগারেট নেয়। সেগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। আমি খানিকটা ধমকাধমকির শব্দ শুনলাম তখন ভেতর থেকে আরো কয়েকজন মানুষ ঘুম ঘুম চোখে বের হয়ে এল। এই ঘরটায় কাদের বক্স মনে হয় তার বডি গার্ডদের নিয়ে ঘুমায়।

"কী দেখছিস?" গলার স্বর শুনে আমি ঘুরে তাকালাম, রিতু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কিছু না। জায়গাটা কীরকম, কারা কোথায় থাকে এইসব।"

"দেখি।"

আমি সরে দাঁড়িয়ে বললাম, "দেখ কিন্তু মনে রাখিস তুই কিন্তু আসলে দেখতে পাস না।"

"জানি।" রিতু বলল, "ঐ মানুষগুলোর সামনে আমি সব সময়ই না দেখার ভান করব। চিন্তা করিস না।"

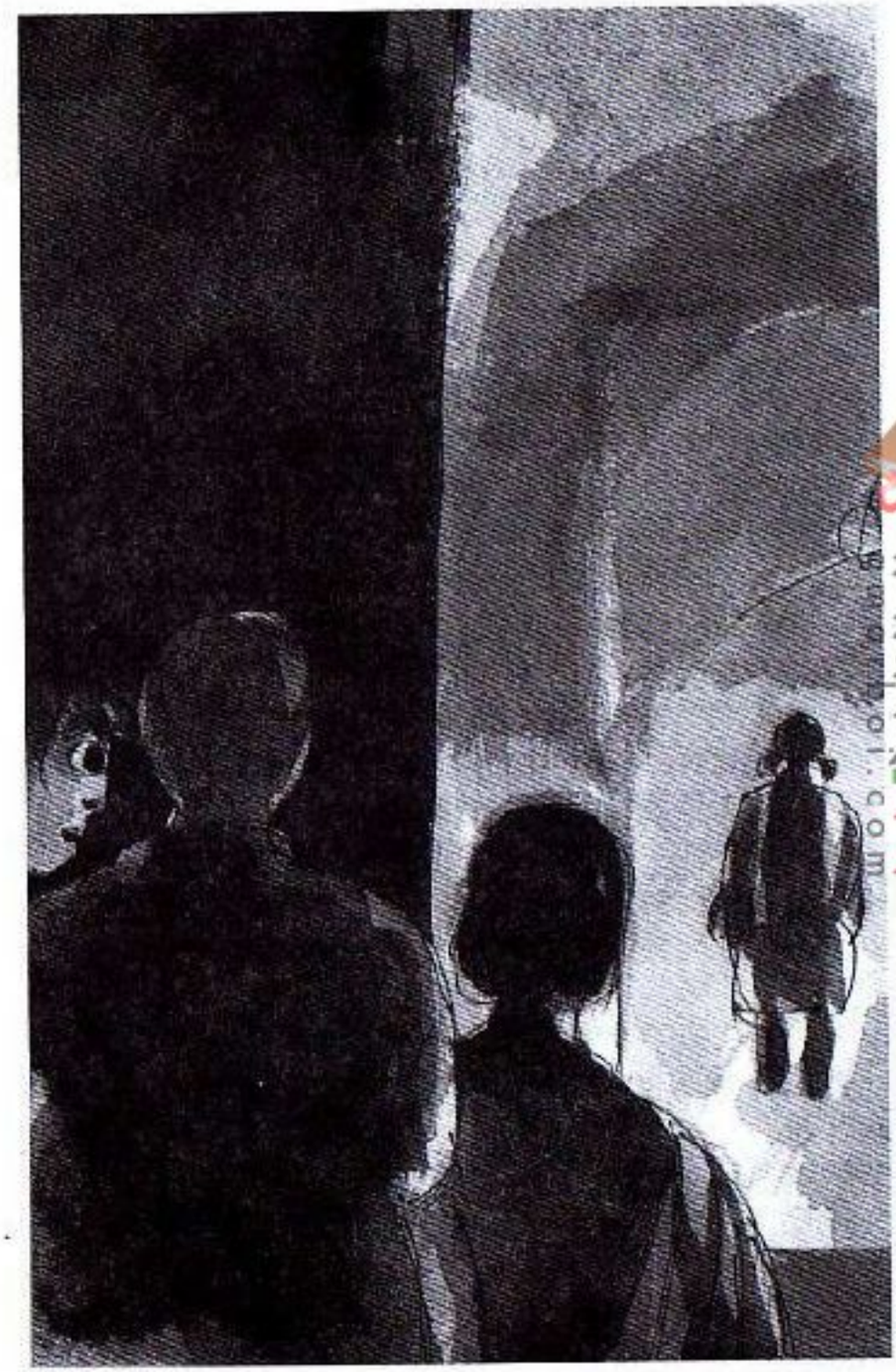

আমারবই.কম

যখন খানিকটা বেলা হল এবং আমরা সবাই উঠে জড়সড় হয়ে বসে আছি তখন হঠাৎ করে দরজায় শব্দ হল। আমরা টের পেলাম কেউ একজন দরজার তালা খুলছে। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল এবং আমরা দেখলাম ভয়ানক চেহারার একজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা হুঙ্কার দেওয়ার মতো শব্দ করল, বলল, "কানা মেয়েটা কই?"

রিতু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে।"

"তুই আয়। অন্যেরা খবরদার ঘর থেকে বের হবি না।"

রিতু জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"নাস্তা নিয়ে আসবি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "ও তো চোখে দেখতে পায় না, ওর বদলে আমি আসি?"

"এই চোখে দেখে না বলেই ওরে আনতে বলছি। তুই চোখে দেখিস তাই চোখ না বেঁধে তোকে ঘর থেকে বের করব না। বুঝেছিস?"

আমি কোনো কথা বললাম না। লোকটা রিতুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। আমরা ঘরের ফুটো দিয়ে তাকালাম, দেখলাম রিতু চোখে দেখতে পায় না এরকম অভিনয় করে খুব সাবধানে মানুষটার সাথে সাথে হেঁটে কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর সে হাতে একটা মাঝারি সাইজের গামলা নিয়ে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আসে। তার পিছনে পিছনে সেই ভয়ানক চেহারার মানুষটা আসছে। মানুষটা ঘরের দরজা খুলে দিল, রিতু সাবধানে গামলাটা মেঝেতে রাখল। মানুষটা বলল, "যা এখন থালা বাসন নিয়ে আয়। পারবি না?"

রিতু মাথা নাড়ল, বলল, "পারব। একটা লাঠি হলে আরো ভালো হত।"

মানুষটা খেঁকিয়ে উঠে বলল, "নবাবজাদির লাঠি লাগবে! যা যা এমনি এমনি যা।"

রিতু তখন এমনি এমনি রওনা দিল। মানুষটা এবারে আমাদের ঘরের দরজায় বসে রিতুর দিকে তাকিয়ে থাকে। রিতু পা ঘষে ঘষে হাত দিয়ে সামনে কী আছে অনুভব করার চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে যায়। আবার কয়েকটা গাছের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার সে হাতে কয়েকটা

টিনের প্লেট আর চামচ নিয়ে ফিরে এলো। চোখে না দেখার নিখুঁত অভিনয়—আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

রিতুকে আরো একবার যেতে হল, এবারে সে একটা পানির জগ আরেকটা গ্লাস নিয়ে এল। ঘরের ভেতরে আবার আমাদের তালা মেরে বন্ধ করার আগে মানুষটা রিতুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোর চোখ তো ভালো আছে, দেখিস না কেন?"

"অপটিক নার্ভ নষ্ট।"

"সেটা আবার কী?"

"চোখ থেকে যে নার্ভ ব্রেনে সিগনাল পাঠায় সেটা নষ্ট।"

"কীভাবে নষ্ট হল?"

"যখন ছোট ছিলাম তখন একবার অসুখ হয়েছিল। ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়েছিল। সেই ওষুধের রি-একশান।"

মানুষটা জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, "হারামজাদা ডাক্তার।"

রিতু বলল, "ইচ্ছা করে তো দেয় নাই। ভুল করে দিয়েছিল।"

"একই কথা।" বলে লোকটা ধরাম করে দরজা বন্ধ করে ঘটাং করে তালা মেরে দিল।

সাথে সাথে আমরা রিতুকে ঘিরে ধরলাম, "বাইরে কী দেখলি?"

"ঐ গাছগুলোর পিছনে আরেকটা ছোট ঘর। কাঠের চুলা আছে, সেখানে রান্নাবান্না হয়। একজন বুড়ো মানুষ রান্না করছে। কয়েকজন মানুষ বন্দুক হাতে জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। দূরে আরো একটা ঘর আছে।"

"সব মিলিয়ে কতোজন মানুষ?"

"এখন দশ জনের মতো। কয়েকজন খাচ্ছে। খেয়ে বের হবে।"

"রাস্তা আছে?"

"হ্যাঁ। একটাই রাস্তা, ডানদিক দিয়ে। নিচে নেমে গেছে।"

"আর আমাদের ঘরে তালা মেরে বাইরে একটা খুঁটির সাথে চাবি ঝুলিয়ে রাখে।"

আঁখি বলল, "আয় আমরা আগে খেয়ে নিই।"

রিতু বলল, "হ্যাঁ। সবাই ভালো করে খা।"

গামলা বোঝাই খিচুড়ি। মানুষগুলি খাবার নিয়ে কিপটেমি করে নি, নিজেরা যে পরিমাণ খায় সে হিসেবে দিয়েছে। আমরা যে অনেক কম খাই সেটা

আমারবই.কম amarboi.com

লোকগুলো জানে না। আমরা সবাই একটা করে টিনের প্লেট নিলাম, শান্তা বড় একটা চামচ দিয়ে আমাদের প্লেটে খাবার তুলে দিল।

খিচুড়িটা বিস্বাদ। লবণ নেই এবং ভয়ানক ঝাল। মাত্র একদিন আগেই আমরা ডাইনিং রুমের বিশাল টেবিলে বসে নাস্তা করেছি, ঝকঝকে গ্লাস, ধবধবে সাদা ন্যাপকিন। অরেঞ্জ জুস, টোস্ট, মাখন, জেলি, ডিম পোচ, দুধ, সিরিয়াল, আপেল, কলা আর গরম চা দিয়ে নাস্তা করেছি। এখন নাস্তা করছি শুধু খিচুড়ি দিয়ে। সেটাও বিস্বাদ আর ঝাল।

সবার জন্যে একটা মাত্র পানির গ্লাস, যে পানিটা দিয়েছে সেটা কোথা থেকে এনেছে জানি না। তারপরেও আমরা পানি খেলাম, যখন তেষ্টা পায় তখন পানি না খেয়ে থাকা যায় না।

খাওয়া শেষ হবার পর আমি লক্ষ্য করলাম আঁখি খিচুড়ির বড় চামচটা হাতে নিয়ে সেটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী করছিস?"

"এই চামচটা পরীক্ষা করছি। বেশ বড় আর শক্ত।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"আমাদের এই ঘরের মেঝেটা মাটির। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা গর্ত করে বের হয়ে যাই না কেন?"

আমরা সবাই আঁখির দিকে তাকালাম। আঁখি চামচটা ঘ্যাচ করে মাটিতে বসিয়ে এক খাবলা মাটি তুলে ফেলল। বলল, "দেখলি, মাটি কাটা যায়।"

সুজন বলল, "গর্ত করব? সেই গর্ত দিয়ে বের হয়ে যায়?"

"হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "চোরেরা যেভাবে সিঁধ কেটে ঢুকে?"

আঁখি বলল, "হ্যাঁ।"

"যদি ধরা পড়ি?"

"ধরা পড়া যাবে না।"

শান্তা বলল, "এই চামচটা তো ফিরিয়ে দিতে হবে।"

রিতু বলল, "এখানে আরো চামচ আছে। আমাকে যদি বের হতে দেয় আমি চুরি করে আরেকটা নিয়ে আসব।"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "ফ্যান্টাস্টিক। ফাটাফাটি বুদ্ধি!"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "মাটিগুলি কী করব? গর্ত করলে যে মাটি বের হবে সেগুলো?"

আমরা থতমত খেয়ে গেলাম, সত্যিই তো, এতগুলো মাটি কী করব? লোকগুলো যদি দেখে ঘরের ভিতর এতো মাটি তা হলেই বুঝে যাবে। আমরা সবাই মাথা চুলকাতে থাকি তখন মামুন বলল, "আমরা যদি দুই ফুট ব্যাসে একটা গর্ত করি, গর্তটা যদি তিন ফুট লম্বা হয় তা হলে মোট মাটি কাটা হবে দশ কিউবিক ফুট। এই ঘরটা হচ্ছে আনুমানিক চার থেকে পাঁচশ বর্গফুট। যদি আমরা মাটিটা সারা ঘরে সমানভাবে ছড়িয়ে দিই তা হলে মেঝেটা বড় জোর এক ইঞ্চির চারভাগের একভাগ উঁচু হবে! কেউ বুঝতে পারবে না।"

রিতু বলল, "ভেরি গুড, সায়েন্টিস্ট সাহেব!"

আঁখি বলল, "তা হলে দেরি করে কাজ নেই। কাজ শুরু করে দিই।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, চুপ করে বসে বসে অপেক্ষা করা খুব কঠিন।"

রিতু বলল, "তা হলে ঠিক করে নে, ঠিক কোথায় গর্ত শুরু করব।"

"দেওয়ালের খুব কাছ থেকে গর্ত করতে হবে। তা হলে তাড়াতাড়ি বের হওয়া যাবে। যেদিকে বের হব সেদিকে যেন মানুষজন হাঁটাহাঁটি না করে।"

রিতু বলল, "সামনে আর ডান পাশে মানুষ থাকে। পিছনে জঙ্গল, মানুষ নেই।"

কাজেই আমরা পিছনের দিকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। একজন চামচ দিয়ে মাটি কাটে অন্যজন মুঠি করে মাটিটা নিয়ে ঘরে ছিটিয়ে দেয়। আরেকজন সেটা পা দিয়ে চেপে সমান করে দেয়। একজন হাতে একটা কম্বল নিয়ে রেডি থাকে—হঠাৎ করে কেউ যদি চলে আসে তা হলে গর্তের উপর কম্বলটা বিছিয়ে দেবে। বাকি দুজন পাহারা, আশেপাশে কাউকে আসতে দেখলেই ইশারা করে তখন আমরা থেমে যাই। কেউ যেন কোনো রকম শব্দও শুনতে না পায়।

এর মাঝে সবচেয়ে কঠিন মাটি কাটা। চামচ না হয়ে যদি একটা খন্তা কিংবা কোদাল পেতাম তা হলে কী সহজে কাজটা করা যেত। যদি খন্তা কোদাল না হয়ে একটা খুরপিও পেতাম তা হলেও কাজটা দশগুণ সহজ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে এখন মাথা ঘামালাম না—হাতের কাছে যেটা পেয়েছি সেটা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি।

কাজ শুরু করার দুই ঘণ্টা পর্যন্ত এমন কোনো গর্তই হল না, আমাদের সন্দেহ হতে লাগল আসলেই আমরা মাটি কেটে সত্যিকারের একটা গর্ত করতে পারব কি না। তৃতীয় ঘণ্টা শুরু করার পর প্রথমবার মনে হতে লাগল যে কাজটা

আমারবই.কম amarboi.com

আসলেই শেষ করা সম্ভব। আমরা যে গতিতে মাটি কেটে যাচ্ছি তাতে মনে হয় রাত বারোটার ভিতরেই আমরা গর্তটা শেষ করে ফেলতে পারব। যদি কোনোভাবে আরো একটা চামচ বা ধারালো কিছু পেয়ে যেতাম তা হলে কাজটা আরো তাড়াতাড়ি শেষ করা যেত।

দুপুরের ভিতর বেশ বড় একটা গর্ত হয়ে গেল। এখন আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে সত্যিই একটা গর্ত তৈরি করে ফেলতে পারব। এরকম সময় দরজায় শব্দ হল এবং বেশ কয়েকজন মানুষ ঘরের ভিতরে ঢুকল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কম্বল দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিয়েছি।

যারা ঢুকেছে তাদের সবার সামনে কাদের বক্স, তার হাতে একটা ক্যামেরা। ভিতরে ঢুকে সে চারিদিকে তাকাল, ভয়ে আমাদের বুক ধুকপুক করতে থাকে। কম্বল দিয়ে যেখানে গর্তটা ঢেকে ফেলা হয়েছে, তার সামনে আঁখি বসে আছে যেন কেউ ওদিকে না যায়।

কাদের বক্স বলল, "সবাই এদিকে আয়।"

আমরা তার কথামতো পাশাপাশি এসে দাঁড়ালাম। তখন সে ক্যামেরা দিয়ে একজন একজন করে আমাদের সবার ছবি তুলল। তারপর জিব দিয়ে সতুটির একটা শব্দ করে বলল, "তোদের ছবি নিয়ে নিলাম।"

আমরা কোনো কথা বললাম না। তখন তাদের বক্স বলল, "তোদের বাপ মায়ের কাছে পাঠাব। কী মনে হয়, তোদের বাপ মা টাকা পয়সা কিছু দেবে? নাকি তোরা সব বাপে খেদানো মায়ে খেদানো ছেলেমেয়ে? তোদের কী হল সেটা নিয়ে বাপ মায়ের কোনো মাথাব্যথা নেই?"

এবারেও আমরা কোনো কথা বললাম না। কাদের বক্স তখন একটু গরম হয়ে বলল, "কী হল, কথা বলিস না কেন?"

আঁখি বলল, "উল্টোটাও তো হতে পারে?"

"উল্টোটা? সেটা আবার কী?"

"আমাদের বাবা মা খুঁজে আপনাদের বের করে ফেলে। পুলিশ মিলিটারি আপনাদের এরেস্ট করে ফেলে।"

কাদের বক্স এরকম একটা উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে থতমত খেয়ে যায়। তারপর হঠাৎ করে রেগে উঠে, "কী বললি তুই? আমি এরেস্ট হব? আমি? কাদের বক্স? শুনে রাখ, পুলিশের বাবার সাধ্যি নাই আমাকে এরেস্ট করে। বুঝেছিস?"

কাদের বক্সের সাথে যে মানুষগুলো এসেছে তাদের একজন বলল, "কতো বড় বেয়াদপ মেয়ে। এক চড় মেরে দাঁতগুলো খুলে ফেলা দরকার? ওস্তাদ দিব নাকি একটা চড়?"

কাদের বক্স হাত নেড়ে বলল, "বাদ দে। মজা তো এখনো টের পায় নাই, সেই জন্যে এতো তেজ!"

কাদের বক্স তার লোকজনকে নিয়ে বের হয়ে গেল আর সাথে সাথে আমরা আবার কাজে লেগে গেলাম। দেখতে দেখতে আমাদের হাত লাল হয়ে উঠল। হাতের চামড়া উঠে গেল, ফোসকা পড়ে গেল কিন্তু আমরা থামলাম না। আমরা মাটি খুঁড়ে যেতেই লাগলাম। খুঁড়ে যেতেই লাগলাম।

মাঝখানে দুপুরে আমাদের খেতে দিল, আগেরবারের মতো রিতুকে আনতে হল না, তাদের একজন নিজেই দিয়ে গেল। খাবারের মেনু খুবই সহজ, শুকনো মোটা রুটি আর বুটের ডাল। আমাদের বাসায় কেউ এরকম একটা খাবার আমাদের জোর করেও খাওয়াতে পারত না। কিন্তু এখানে আমরা গপগপ করে রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে খেলাম। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমাদের সবারই পরিশ্রম হয়েছে, সবারই পেটে খিদে! সত্যি কথা কী এই মোটা রুটি আর বুটের ডালকে মনে হল অসাধারণ!

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকারে আমরা হাতড়ে হাতড়ে কাজ করি। আঁখির মাঝে আর আমাদের মাঝে তখন আর কোনো পার্থক্য থাকে না। আঁখি তখন গর্তটা পরীক্ষা করে আমাদের বলে দেয় কোনদিকে কতোটুকু গর্ত করতে হবে। আমরা সেদিকে গর্ত করি। রাতে আমাদের কিছু খেতে দিল না। একেবারে কিছু দিল না সেটা সত্যি নয়, ঘরের জানালা দিয়ে কিছু কলা ধরিয়ে দিল। মোটা মোটা কলা, খেতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম পুরোটাই বিচি দিয়ে ভরা। কলার যে বিচি থাকে আমরা সেটাই কোনোদিন জানতাম না। এক কামড় কলা খেতে হলে পুটুর পুটুর করে একশটা বিচি মুখ থেকে ছুড়ে দিতে হয়—ভারি যন্ত্রণা। বাসায় রাত্রি বেলা ভালো করে খাওয়ার জন্যে আম্মু কতোরকম সাধাসাধি করেন—আর এখানে রাতের খাবার হচ্ছে জন প্রতি একটা করে বিচিকলা, কপাল আর কাকে বলে।

তবে সেই বিচিকলা খেয়েই আমরা কাজ করে গেলাম। গভীর রাতে যখন বাইরের মাটি ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে গর্তটা বের হয়ে গেল আমরা তখন ঘরের ভেতরে এতোটুকু শব্দ না করে আনন্দে নাচানাচি করতে থাকি। কাদের বক্স আর তার দলের নাকের ডগা দিয়ে আমরা এখন পালিয়ে যাব!

আমারবই.কম amarboi.com

১৩

যখন আমরা বুঝতে পারলাম খুব বিপদের মাঝেও কেমন করে সবাই মিলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়

রিতু বলল, "এখন আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। বাইরে বের হয়ে আবার যেন ওদের হাতে ধরা না পড়ি।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ।"

শান্তা বলল, "কিন্তু বের হয়ে আমরা কোনদিকে যাব? আমাদের চোখ বেঁধে এনেছে, কিছু দেখি নি। আমরা তো এই জঙ্গলে রাস্তা চিনি না।"

আঁখি বলল, "আমি রাস্তা চিনি।"

আমরা অবাক হয়ে বললাম, "তুই রাস্তা চিনিস?"

"হ্যাঁ। তোদের চোখ বেঁধে এনেছে—তোরা কিছু দেখিস নি। আমার দেখতে হয় না, আমি তোদের নদী পর্যন্ত নিয়ে যাব। সেখানে অপেক্ষা করলে আগে হোক পরে হোক কারো না কারো নৌকা আসবে।"

শান্তা ইতস্তত করে বলল, "যদি না আসে তা হলে?"

মামুন বলল, "তা হলে আমরা নদীর তীর ধরে হাঁটতে থাকব। একসময় না একসময় কোনো মানুষের বাসা পেয়ে যাব।"

রিতু বলল, "হ্যাঁ দরকার হলে আমরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারব। যতদিন দরকার।"

আঁখি মাথা নাড়ল, বলল, "যতদিন দরকার।"

রিতু বলল, "এই ঘর থেকে বের হয়ে প্রথমেই কী করতে হবে জানিস?"

"কী?"

"ঘরের তালাটা খুলে সেই তালাটা লাগাতে হবে কাদের বক্সের দরজায়। বাইরে খাম্বায় চাবি ঝুলিয়ে রাখে। আমি দেখেছি।"

আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "ভেরি গুড! ওরা যদি তা হলে টেরও পায় তারপরেও আমাদের পিছু পিছু আসতে পারবে না।"

আমরা তখন বসে বসে পুরো পরিকল্পনাটার খুঁটিনাটি অনেকবার আলোচনা করলাম। খোদা না করুক হঠাৎ করে যদি ধরা পড়ে যাই তা হলে কী করতে হবে, কে কোনদিকে পালাবে, আঁখির সাথে কে থাকবে সবকিছু ঠিক করে নিলাম। তারপর ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে রেডি হলাম।

আমি সবার আগে গর্ত দিয়ে বের হলাম। গর্তটা আরেকটু বড় হলে ভালো হত, বের হতে আমার বেশ কষ্ট হল, ভিতর থেকে তাদের আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করতে হল। কাপড় জামাতে মাটি লেগে গেল এবং ঘাড়ের কাছে মনে হল খানিকটা ছালও উঠে গেল।

আমি বের হয়ে চারিদিকে তাকালাম। আশেপাশে কেউ নেই। আকাশে একটা চাঁদ উঠেছে, সেই চাঁদের আলোতে চারপাশের গাছগুলোর লম্বা ছায়া পড়েছে। কাছাকাছি কোথাও ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল আমি বের হতেই সেটা থেমে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার ঝিঁঝি পোকা ডাকতে শুরু করে। আমি গর্তে মাথা ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "আয় পরের জন।"

এবারে সুজন বের হয়ে এলো। সুজন মনে হয় আমার থেকে মোটা, তার কারণ সে মাঝখানে আটকে গেল, বাইরে বেরও হতে পারে না, ভিতরে ঢুকেও যেতে পারে না। আমি তাকে বাইরে টানতে লাগলাম, অন্যেরা ভিতর থেকে ঠেলতে লাগল, শেষ পর্যন্ত সে বাইরে বের হয়ে এল। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিসফিস করে বলল, "জানটা আর একটু হলে বের হয়ে যেত! ইস্ পেটের চামড়া উঠে গেছে!"

"কথা বলিস না! বের হয়েছিস সেটাই বেশি।"

সুজন হাসার চেষ্টা করল, চাঁদের আলোতে সেই হাসিটা খুব ভালো দেখা গেল না। আমি আবার গর্তে মাথা ঢুকিয়ে বললাম, "এই বারে কে?"

আঁখি বলল, "আমি।"

মেয়েদের শরীর মনে হয় অনেক বেশি ভাঁজ হতে পারে, কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই আঁখি বের হয়ে আসল। আঁখির পরে রিতু, তারও কোনো সমস্যা হল না। শান্তাকে একটু ধাক্কাধাক্কি করতে হল। সবার শেষে মামুন, তাকে

আমারবই.কম amarboi.com

আমরা সবাই মিলে টেনে বের করে ফেললাম। আমাদের টানাটানিতে সে বের হল সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কিন্তু সে জন্যে তার ঘাড় এবং পেটের ছাল অনেকখানি উঠে গেল বলে মনে হল। এখন অবশ্যি সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

আমরা নিঃশব্দে ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। রিতু পা টিপে ঘরের খাম্বার সাথে ঝোলানো চাবিটা এনে আমাদের ঘরের তালাটা খুলে নেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, "তোরা সবাই এখানে অপেক্ষা কর। আমি আর তিতু কাদের বক্সকে তালা মেরে আসি।"

তখন আমি আর রিতু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে কাদের বক্সের ঘরের সামনে গেলাম। ঘরের ভেতর থেকে নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। আমি তার মাঝে দরজার কড়া দুটো ধরে কাছাকাছি এনে রাখলাম, রিতু তখন খুট করে তালা মেরে দিল। ঠিক তখন ঘরের ভেতর থেকে বিড়বিড় করে কেউ কিছু একটা কথা বলল। এক মুহূর্তের জন্যে আমরা ভয় পেয়ে একেবারে পাথরের মতো জমে গেলাম, কিন্তু দেখলাম ভয়ের কিছু নেই, কেউ ঘুম থেকে উঠে নি, কেউ একজন ঘুমের ভিতর কথা বলছে।

আমরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করি, তারপর দুজন পা টিপে টিপে অন্যদের কাছে ফিরে আসি। সবাই খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল, আমাদের ফিরে আসতে দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শান্তা বলল, "চল, রওনা দিই। আঁখি, কোনদিকে যাব?"

আঁখি জঙ্গলের ভেতর একটা পথ দেখিয়ে বলল, "এদিকে।"

আমরা তখন আঁখির পিছনে পিছনে রওনা দিয়েছি, দশ পাও অগ্রসর হই নি হঠাৎ আঁখি দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, চাপা স্বরে বলল, "সাবধান।"

আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কী হয়েছে?"

"মানুষ।"

"কোথায়?"

"সামনে।"

আমরা কোনো মানুষ দেখতে পেলাম না কিন্তু আঁখি যখন বলেছে তখন মানুষ নিশ্চয়ই আছে। আমি বললাম, "তোরা অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসি।"

রিতু বলল, "খুব সাবধান কিন্তু, কোনোভাবে যেন টের না পায়।"

"ঠিক আছে।"

আমি খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাই। গাছের শুকনো পাতায় পা পড়ে যেন কোনো শব্দ না হয় সেজন্যেও প্রত্যেকবার পা ফেলার আগে জায়গাটা পা দিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। বেশ খানিক দূর নিচে নামার পর আমি মানুষটিকে দেখতে পেলাম। একটা গাছে রাইফেলটাকে হেলান দিয়ে রেখে উবু হয়ে বসে আছে। চাঁদের আলোতে মানুষটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে, মনে হল শুকনো ছোটখাটো মানুষ। সে নিশ্চয়ই এলাকাটাকে পাহারা দিচ্ছে। তাকে একটা মশা কামড় দিল, হাত দিয়ে মশাটাকে মারার চেষ্টা করে বিড় বিড় করে সে মশাটাকে খারাপ ভাষায় খানিকক্ষণ গালাগাল করল।

আমি আবার খুব সাবধানে অন্য সবার কাছে ফিরে এলাম। তারা উদ্বিগ্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রিতু জিজ্ঞেস করল, "আছে মানুষ?"

"হ্যাঁ। আছে।"

"সর্বনাশ!"

"রাইফেল নিয়ে বসে আছে। পাহারা দিচ্ছে।"

"তা হলে উপায়?"

মামুন বলল, "অন্যদিক দিয়ে যাই।"

আঁখি বলল, "আমি কিন্তু অন্যদিকের রাস্তা চিনি না! আমি শুধু এইটাই চিনি।"

রিতু বলল, "খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলি।"

আমরা অন্যদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। একদিকে খাড়া খাদ— যাওয়ার উপায় নেই। অন্যদিকে ঘন জঙ্গল, কাঁটা গাছ। আমরা হতাশভাবে ফিরে এলাম, যাওয়ার রাস্তা এই একটাই, সেইজন্যে এখানেই পাহারা। তখন সুজন বলল, "আয়, মানুষটাকে এটাক করি!"

আমরা সবাই সুজনের দিকে তাকালাম, "এটাক?"

"হ্যাঁ। আমরা ছয়জন যদি পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি তা হলে বেটা যাবে কোথায়?"

কথাটি সত্যি। আমরা ছয়জন মানুষ, ছয়জন মানুষ যদি একসাথে কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে সেই মানুষটা যাবে কোথায়? তারপরেও শান্তা একটু ইতস্তত করে বলল, "মারামারি? আমি জীবনে মারামারি করি নাই।"

আমারবই.কম amarboi.com

"আমরাই কী করেছি নাকি?" আমি বললাম, "সুজন ছাড়া আর কে মারামারি করে?"

"তা হলে?"

"আজকে করতে হবে।"

আঁখি বলল, "আগে চেষ্টা করি মারামারি ছাড়া মানুষটাকে ধরতে।"

"সেটা কীরকম?"

"খুব আস্তে আস্তে পিছন থেকে যাব। একজন মানুষটার পিছনে একটা গাছের ডাল ধরে গলা মোটা করে বলবি 'হ্যান্ডস আপ। নড়লেই গুলি।' মানুষটা যদি হাত উপরে তুলে সারেন্ডার করে তা হলে হাত বেঁধে ফেলবি। যদি সারেন্ডার না করে তখন সবাই মিলে এটাক করব।"

রিতু বলল, "কিন্তু তা হলে মানুষটা তো জেনে যাবে।"

"আমরা কারা কয়জন সেটা তো জানবে না। গলা মোটা করে বলতে হবে যেন বুঝতে না পারে আমরা কারা।"

প্রথমেই মারামারি করতে হবে না, শুধু দরকার হলে তখন মারামারি, সেজন্যে সবাই রাজি হয়ে গেল। সুজন বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি মারামারি করতে হয় তা হলে কেউ কিন্তু পিছাতে পারবি না।"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

রিতু বলল, "রান্না ঘরের কাছে অনেকগুলো চ্যালাকাঠ আছে। সবাই একটা করে নিয়ে নিই, যদি দরকার হয় দমাদম করে বাড়ি দিব।"

আমরা সবাই রাজি হলাম। রিতু আমাদেরকে রান্নাঘরের কাছে নিয়ে গেল। সেখান থেকে সবাই নিজেদের পছন্দমতো লাঠি বেছে নিলাম। উঠানে কাপড় ধুয়ে শুকাতে দেয়ার দড়ি পাওয়া গেল, সেটাও খুলে নেয়া হল। পিছন থেকে ধরে ভয় দেখানোর জন্যে একটা বাঁশের কঞ্চি বেছে নেয়া হল—সেটা মোটামুটি বন্দুকের নলের মতো।

মামুন জিজ্ঞেস করল, "কে হ্যান্ডস আপ বলবে?"

আঁখি বলল, "যে গলা মোটা করে বলতে পারবে, সে।"

আমরা সবাই গলা মোটা করে বললাম, আঁখি শুনে আমার গলাটা পছন্দ করল। আমি আরো কয়েকবার প্র্যাকটিস করলাম, যখন আঁখি বলল কাজ চলে যাবে তখন আমরা রওনা দিলাম। রওনা দেওয়ার আগে ঠিক করে নিলাম যদি আমাদের পরিকল্পনা কাজ না করে, মানুষটা যদি দেখে ফেলে তা হলে একেবারে

আমারবই.কম amarboi.com

হইহই করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সবার আগে রাইফেলটা কেড়ে নিতে হবে। যেভাবে হোক।

এবারে আমরা রওনা দিলাম। সবার বুক ধক ধক করে শব্দ করছে, মনে হচ্ছে সেই শব্দ বুঝি সবাই শুনতে পাচ্ছে। আমরা সবাই খুব সাবধানে পা টিপে টিপে যাচ্ছি। সবাই খুব সতর্ক যেন এতোটুকু শব্দ না হয়। সবার আগে আমি, সবার পিছনে আঁখি। আমার হাতে বাঁশের কঞ্চি, আঁখির হাতে দড়ি, অন্য সবার হাতে চ্যালাকাঠ।

কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আমরা সবাই মানুষটাকে দেখতে পেলাম, আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। একটা গাছে রাইফেলটা হেলান দেয়া। একটা জায়গায় এসে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আঁখি দাঁড়িয়ে গেল। অন্য পাঁচজন এগিয়ে যেতে থাকি। মানুষটাকে পিছন থেকে ঘিরে ফেলা হল, আমি খুব সাবধানে এগিয়ে গেলাম। আমার সাথে সুজন, আমি যখন তার পিছনে বাঁশের কঞ্চিটাকে লাগিয়ে বলব হ্যান্ডস আপ তখন সে একই সাথে রাইফেলটাকে ছিনিয়ে নেবে। আমরা মাথা নিচু করে পা টিপে টিপে এগুতে থাকি, আর মাত্র কয়েক পা, উত্তেজনায় আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করতে থাকে।

ঠিক এই সময় মানুষটা কেমন যেন ঝটকা মেরে নড়েচড়ে বসল। আমরা সবাই পাথরের মতো জমে গেলাম। মানুষটা তখন তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট বের করে মুখে লাগায়। তারপর ফস করে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরানোর জন্যে মাথা নিচু করে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়, আমি এক লাফে মানুষটার পিছনে গিয়ে বাঁশের কঞ্চিটা তার পিঠে ধরলাম, মুহূর্তের মাঝে সুজন রাইফেলটা ঝটকা মেরে তুলে নিল। কী বলতে হবে এতোক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করে আসছিলাম, এখন সেটা ভুলে গিয়েছি। যা মনে আসল গলা মোটা করে সেটাই বলে ফেললাম, "ব্যাটা বদমাইশের বাচ্চা। একেবারে খুন করে ফেলব। একটু নড়েছিস কী গুল্লি। মাথার ঘিলু বের করে ফেলব!"

মানুষটা নড়ল না, ভাঙা গলায় বলল, "কেডা? ইসমাইল? বিশ্বাস করেন আমার দোষ নাই। আমি—"

ইসমাইল কে, কেন তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে জানি না। আমি মাথাও ঘামালাম না, গলা মোটা করে বললাম, "একটা কথা না, হাত উপরে তোল।"

তার হাত থেকে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি আর সিগারেট নিচে খসে পড়ল, সে দুই হাত উপরে তুলল। সবাই তখন কাছাকাছি ছুটে আসে। সবার আগে আঁখি, সে দড়িটা এগিয়ে দেয়। আমি মানুষটার হাত দুটো পিছনে নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধতে শুরু করি।

ঠিক এরকম সময়ে মানুষটার কী যেন সন্দেহ হল, সে মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, হঠাৎ করে সে বুঝে গেল, ইসমাইল নয়—তাকে ধরেছি আমরা! মানুষটা তখন ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে—দমাদম করে তার পিঠে চ্যালাকাঠ এসে পড়তে থাকে। শুধু তাই না, সুজন রাইফেলটা তাক করে বলল, "নড়লেই গুলি। নড়লেই গুলি।"

আমার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গুলি বের হয় না, কিন্তু এই ভয়ানক রাইফেল দিয়ে নিশ্চয়ই গুলি বের হয়, মানুষটা সেটা জানে। ভুল জায়গায় টেপাটেপি করলে সত্যি সত্যি গুলি বের হয়ে যেতে পারে সেটা এই মানুষটা টের পেয়েছে, কাজেই সে নড়ল না। মানুষটা উপুর হয়ে শুয়ে রইল আর আমরা খুব ভালো করে তার হাত দুইটা পিছনে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম।

মানুষটা বিড় বিড় করে বলল, "তো-তোমরা? তো-তোমরা কীভাবে?"

সুজন লাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, "আমরা কীভাবে সেটা এখনো দেখ নাই! তোমাদের সবগুলোকে ধরে এখন জেলে ঢোকানো হবে।"

মানুষটার হাত দুটো বাঁধা শেষ হলে যখন পা দুটো বাঁধছি তখন হঠাৎ করে মানুষটা একটু মাথা তুলে কী যেন দেখল। সে কী দেখল আমরা বুঝতে পারলাম না কিন্তু হঠাৎ করে প্রচণ্ড আতঙ্কে সে উঠে বসে তারপর হাত বাঁধা অবস্থাতেই নিচের দিকে ছুটতে শুরু করে। মানুষ দৌড়ায় পা দিয়ে কিন্তু দৌড়ানোর জন্যে হাত দুটোর খুব দরকার। হাত ব্যবহার করতে না পারলে কিছুতেই তাল সামলানো যায় না, তাই মানুষটাও তাল সামলাতে পারল না, সে হুড়মুড় করে নিচে গড়িয়ে পড়ল। কোনোমতে আবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে থাকে, ধরাম করে আবার একটা গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে সে পড়ে গেল। আবার ওঠে দাঁড়াল তারপর আবার ছুটতে লাগল। দেখে মনে হল মানুষটার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কী হল? মানুষটা কী দেখে এতো ভয় পেয়েছে?"

আমারবই.কম amarboi.com

আঁখি বলল, "আগুন। আমি ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি।"

আমরা ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম না কিন্তু দেখতে পেলাম কাছাকাছি ধিকিধিকি করে আগুন জ্বলছে। এই মানুষটাকে যখন আমরা ধরেছি তখন তার সিগারেট আর ম্যাচের কাঠি নিচে ছিটকে পড়েছিল। সেখান থেকে নিশ্চয়ই শুকনো পাতায় আগুন লেগেছে। আগুন নিশ্চয়ই একটা ভয়ের জিনিস কিন্তু এই মানুষটা যেভাবে ভয় পেয়েছে আগুন দেখে সেভাবে ভয় পাওয়ার কথা না। আগুনটা দাউ দাউ করেও জ্বলছে না—ধিকিধিকি করে জ্বলছে, এই আগুন দেখে এতো ভয় পাওয়ার কথা আছে? আগুনটা ছড়াতেও তো সময় লাগবে।

ঠিক তখন আমি বুঝতে পারলাম মানুষটা কেন এতো ভয় পেয়েছে। খুব কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয় গোলাবারুদ রাইফেল গ্রেনেড লুকানো আছে—আগুনটা সেদিকে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এক্ষুনি সেগুলো বিস্ফোরিত হবে। সেই জন্যে মানুষটা এতো ভয় পেয়েছে। সর্বনাশ!

আমি চিৎকার করে বললাম, "পালা! সবাই পালা!"

"কেন?"

"এই আগুন নিশ্চয়ই গোলাবারুদ গ্রেনেডের দিকে যাচ্ছে। এক্ষুনি নিশ্চয়ই ফাটবে।"

সাথে সাথে অন্য সবাইও বুঝে গেল মানুষটা কেন ভয় পেয়েছে। আমরাও তখন নিচের দিকে ছুটতে থাকি। অন্যেরা খুব তাড়াতাড়ি ছুটে সামনে এগিয়ে যায়, আমি একটু পিছনে পড়ে গেলাম। আঁখি আমার কাঁধে হাত দিয়ে দৌড়াচ্ছে সে জন্যে আমাদের দেরি হচ্ছিল। কোনো একটা গাছের লতায় পা বেঁধে আঁখি একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে কোনোমতে টেনে তুলে বললাম, "ঠিক আছে?"

"নাই!" আঁখি ককিয়ে উঠে বলল, "পায়ে ব্যথা পেয়েছি।"

"কষ্ট করে চলে আয়।"

আঁখি হাঁটার চেষ্টা করে বলল, "পারছি না।"

"আমার ঘাড়ে হাত দে।"

আঁখি আমার ঘাড়ে ধরল, আমি তার ঘাড়ে ধরলাম। আঁখি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হাঁটার চেষ্টা করে। আমি শুনতে পেলাম সামনে থেকে রিতু ডাকছে, "তিতু আঁখি তোরা কোথায়?"

"আঁখি ব্যথা পেয়েছে।"

সাথে সাথে দুদ্দাড় করে সবাই চলে এল। সুজন আর আমি আঁখিকে দুই পাশে ধরে টেনে নিচে নামাতে থাকি। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে থাকে এই বুঝি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনব আর আমরা সবাই টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাব।

পাহাড়ি পথটা সোজা নিচের দিকে নেমে এক জায়গায় ডান দিকে ঘুরে গেল, আমরা ডান দিকে যখন ঘুরে কয়েক পা এগিয়েছি তখন প্রথম বিস্ফোরণের শব্দটা শুনতে পেলাম, সেই শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই প্রচণ্ড আরেকটা বিস্ফোরণে পুরো এলাকাটা কেঁপে উঠল। মনে হল আমাদের পায়ের নিচে বুঝি মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমরা নিচে ছিটকে পড়লাম আর আমাদের উপর দিয়ে আগুনের মতো গরম বাতাসের একটা হলকা ছুটে গেল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে আমাদের কানে তালা লেগে যায়, আমরা দেখতে পেলাম আলোর ঝলকানিতে মুহূর্তের জন্যে চারিদিকে আলোকিত হয়ে গেছে। আমরা মাথা নিচু করে ঘাপটি দিয়ে বসে আছি আর মনে হল আকাশ থেকে পাথর মাটি গাছের ডালপাতা আমাদের উপর বৃষ্টির মতো পড়ছে। ভেবেছিলাম একটা বিস্ফোরণ হয়ে থেমে যাবে—কিন্তু সেটা থামল না, ছাড়া ছাড়া ভাবে বিস্ফোরণ হতে লাগল। মনে হতে লাগল বুঝি সেটা কখনোই থামবে না।

শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণের শব্দ থামল, আমি তখন খুব সাবধানে মাথা তুলে তাকালাম, বললাম, "সবাই ঠিক আছিস?"

একজন একজন করে সবাই মাথা তুলে উঠে বসে, শরীর থেকে মাটি পাথর গাছের ডাল সরাতে সরাতে বলল, "মনে হয় ঠিক আছি।"

বিস্ফোরণের কারণে আগুন লেগে গেছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। বিচিত্র এক ধরনের কাঁপা কাঁপা লালচে আলো। আমি দেখতে পেলাম সবাই মাথা তুলেছে, যার অর্থ সবাই এখনো বেঁচে আছি। আহা! বেঁচে থাকা কী চমৎকার একটা ব্যাপার।

শান্তা কাঁপা গলায় বলল, "কাদের বক্স আর তার গার্ডের কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "ওরা তো পাহাড়ের উপরে ছিল। মনে হয় কিছু হয় নাই।"

"কিন্তু আগুন?"

"আগুন নেভাতে নিশ্চয়ই আসবে লোকজন।"

"এই পাহাড়ে কী আর ফায়ার ব্রিগেড আছে? কে নেভাবে?"

উত্তরটা আমরা কেউ জানি না তাই চুপ করে রইলাম।

আঁখি ফিসফিস করে বলল, "দুইটা স্পিড বোট আসছে।"

আমারবই.কম amarboi.com

আমরা কেউ কিছু শুনতে পেলাম না, কিন্তু আঁখি যখন বলেছে তার মানে সত্যিই আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি আমরাও সেই স্পিড বোটের শব্দ শুনতে পেলাম।

রিতু বলল, "নিশ্চয়ই পুলিশ, মিলিটারি।"

"হ্যাঁ।" আমরা মাথা নাড়লাম, "এখানেই নিশ্চয়ই আসছে।"

বিস্ফোরণের শব্দ নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে শোনা গেছে। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, তাই কোথায় আসতে হবে সেটা বুঝতে পুলিশের সমস্যা হবার কথা না।

আস্তে আস্তে স্পিড বোটের ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে যেতে থাকে, বাড়তে বাড়তে একেবারে কাছাকাছি এসে থেমে যায়। আমরা তখন মানুষের গলা শুনতে পেলাম। একটু পরে তাদের হাতের টর্চ লাইটের আলো দেখতে পাই। সেগুলো নড়তে নড়তে এগিয়ে আসছে। আমরা তখন উঠে দাঁড়ালাম, শরীর থেকে মাটি, গাছের ডাল পাতা ঝেড়ে আমরা অপেক্ষা করি। আঁখি আমাকে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "আমার আব্বুও এসেছেন।"

আমি আলাদা করে কারো গলার আওয়াজ পাচ্ছি না কিন্তু আঁখি যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই তার আব্বুও এসেছেন। সে সবকিছু অনেক দূর থেকে শুনতে পায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোর পায়ের অবস্থা কেমন?"

"ব্যথাটা কমেছে। তার মানে হাড় ভাঙে নি।"

রিতু আমাদের কাছে এসে বলল, "যখন আমরা এখান থেকে যাব তখন আমি প্রথমেই কী করব জানিস?"

"কী?"

"একেবারে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে গোসল করব। ফ্রেশ একটা সাবান দিয়ে অনেকক্ষণ সময় লাগিয়ে। তারপরে ধোয়া কড়কড়ে পরিষ্কার একটা কাপড় পরব।"

আঁখি হাসল, বলল, "ঠিক বলেছিস। আমিও তাই করব। নুতন টুথ ব্রাশ দিয়ে সবার আগে দাঁত ব্রাশ করে অনেক লম্বা একটা গোসল।"

শান্তা বলল, "আমি প্রথমে খাব। গরম ভাতের সাথে একটা ডিম ভাজা খাব। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত।"

সুজন বলল, "আমি কাদের বক্সের পেটে একটা ঘুষি মারব। সবার আগে ঘুষি। বদমাইসের বাচ্চা।"

আমরা হি হি করে হাসলাম। রিতু মামুনকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করবি?"

"আমি নরম একটা বিছানায়, নরম তুলতুলে একটা বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ব। তারপর একটা ঘুম। নাক ডেকে ঘুম। টানা চব্বিশ ঘণ্টা।"

আঁখি আমাকে জিজ্ঞেস করল "তুই কী করবি?"

"আমি?"

"হ্যাঁ?"

"আমি পরিষ্কার একটা বাথরুমে, পরিষ্কার একটা টয়লেটে বসে—" সবাই হি হি করে হেসে আমার পিঠে কিল মেরে বলল, "চুপ কর। চুপ কর অসভ্য কোথাকার!"

ঠিক তখন একটা টর্চ লাইটের তীব্র একটা আলো আমাদের চোখে এসে পড়ল, আমরা সবাই কথা বন্ধ করে সামনে তাকালাম। আলোর কারণে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আঁখির চোখ ধাঁধায় নি, সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "আব্বু। তোমরা এসেছ?"

"হ্যাঁ। মা। এসেছি।"

"থ্যাংকু আব্বু।"

"তোরা সবাই ভালো আছিস?"

"হ্যাঁ আব্বু আমরা সবাই ভালো আছি।"

"খোদা মেহেরবান!" আঁখির আব্বু একটু এগিয়ে এসে ধরা গলায় বললেন, "আমি খোদার কাছে শুধু তোদেরকে ফিরে চেয়েছি। খোদা আমাকে তোদের সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি এই জীবনে খোদার কাছে আর কিছু চাইব না!"

আঁখি বলল, "আমরাও চাইব না আব্বু।"

রিতু বলল, "চাচা। আমরা কাদের বক্সকে তার ঘরে তালা মেরে রেখে এসেছি। আগুন ছড়িয়ে পড়লে সে বের হতে পারবে না।"

আঁখির আব্বু, অবাক হয়ে বললেন, "কাদের বক্সকে? তালা মেরে রেখেছ? সেটা কীভাবে সম্ভব?"

আঁখি বলল, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি। তোমাদেরকে বলব।"

সুজন তখন এগিয়ে এসে হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে বলল, "আমরা একটা পাহারাদারের কাছ থেকে এটা কেড়ে রেখেছি। মানুষটার হাত বাঁধা, তার মাঝে পালিয়ে গেছে।"

আমারবই.কম amarboi.com

মিলিটারির একজন অফিসার বলল, "ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কর না, ওকে আমরা এক্ষুনি খুঁজে বের করে ফেলব।"

গলার স্বর শুনে আমরা তাকে চিনে ফেললাম, রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি চেক করার সময় তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। সুজন রাইফেলটা দেখিয়ে বলল, "চাচা, এই রাইফেলটা কী আমি নিতে পারি?"

মিলিটারি অফিসার হেসে ফেললেন, বললেন, "কেন কী করবে?"

"এমনি। স্কুলে নিয়ে সবাইকে দেখাব!"

"এটাকে বলে একে ফোর্টি সেভেন। এটা হচ্ছে সত্যিকারের আর্মস। তোমার হাতে ওটা দেখেই ভয়ে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি ভুল করে কোনো কিছু টেনে ধর আমরা সবাই ফিনিশ হয়ে যাব! ওটা বরং আমাদের হাতে দাও, আমি বরং একদিন তোমাদের স্কুলে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আনব।"

সুজন খুবই অনিচ্ছার সাথে তার একে ফোর্টি সেভেনটা মিলিটারি অফিসারের হাতে তুলে দিল।

১৪

যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা যেটাই চাই সেটাই করে ফেলতে পারি শুধু সেটা করার ইচ্ছে থাকতে হয়

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। কাদের বক্স আর তার দলবলকে ধরা হয়েছে। অস্ত্র আর গোলাবারুদ চোরাচালানের বিশাল একটা দল ধরা পড়েছে এই খবরটা পত্রপত্রিকা রেডিও টেলিভিশনে অনেক বড় করে প্রচার হয়েছে শুধু খুব সাবধানে আমাদের কথাগুলো সেখানে বলা হয় নি। এই দলগুলো খুব ভয়ংকর তাদের নাকি দেশ-বিদেশেও এজেন্ট আছে—তাই সবাই মিলে আমাদের কথা গোপন রেখেছে।

স্কুলে অবশ্যি আমরা সবাইকে আমাদের গল্পটা বলেছি। ছোট ছোট ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাদের দেখলেই গল্পটা আবার শুনতে চায়। আমাদের এতো ধৈর্য নেই কিন্তু আঁখির অনেক ধৈর্য। সে হাত-পা নেড়ে গলার স্বর উঁচু-নিচু করে অভিনয়ের ভঙ্গিতে পুরো গল্পটা বলে। সে তার চোখ দিয়ে কিছুই দেখে নি কিন্তু এতো সুন্দর করে সবকিছু বর্ণনা দেয় যে মনে হয় কোনো কিছু দেখার জন্যে বুঝি চোখের দরকারই নেই। সবচেয়ে সুন্দর হয় তার বিস্ফোরণের বর্ণনাটা, কাঁপা কাঁপা গলায় সে এমনভাবে ঘটনাটা বলে যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, তাদের মুখ হাঁ হয়ে থাকে আর নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যায়। কী মজার একটা দৃশ্য!

আমাদের স্কুলে আরো দুজন ভর্তি হয়েছে যারা চোখে দেখতে পায় না। একজন ক্লাস সিক্সে একজন ফোরে। ক্লাস সেভেনে একজন ভর্তি হয়েছে যে হুইল চেয়ারে বসে থাকে। সে যেন ক্লাস রুমে যেতে আসতে পারে সেজন্যে

আমারবই.কম amarboi.com

সিঁড়ির পাশে ঢালু জায়গা তৈরি করা হয়েছে। আমাদের নূতন ম্যাডাম সারা স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ঢালু জায়গাগুলো তৈরি করেছেন। খুব মজা হয়েছিল সেদিন।

হুইল চেয়ারের ছেলেটা মোটেও জবুথবু নয়। সে খুবই দুষ্টু—কেউ তার সাথে দুষ্টুমি করলে সে তার পায়ের উপর দিয়ে হুইল চেয়ার চালিয়ে দেয়। প্রায়ই দেখা যায় কিছু একটা ঘটেছে আর সে তার হুইল চেয়ার নিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটে যাচ্ছে আর সবাই তার পিছনে পিছনে তাকে ধরার জন্যে ছুটছে।

সামনে আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট। ক্লাস সেভেনের টিমে নাকি হুইল চেয়ারের ছেলেটা খেলবে। কীভাবে সে ফুটবল খেলবে আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আঁখি যদি আমাদের ক্রিকেট টিমে খেলতে পারে, তা হলে সে কেন খেলতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। ক্লাস সেভেনের ছেলেমেয়েরা কিছু একটা কায়দা কানুন নিশ্চয়ই বের করবে—সেটা কী হতে পারে দেখার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

আমরা সবাই একটা জিনিস বুঝে গেছি। কোনো কিছুই অসম্ভব না। সবকিছু করে ফেলা যায়—শুধু সেটা করার জন্যে ইচ্ছেটা থাকতে হয়।

আমাদের ইচ্ছে আছে। কী কী ইচ্ছে আছে সেটা সবাইকে এক্ষুনি বলব না। যখন বলব তখন সবার চোখ একেবারে ট্যারা হয়ে যাবে!

আমারবই.কম
amarboi.com